আষাঢ় ১৩৮৪

আনন্দমেলা

ইস্কুলে চ্যাম্পিয়ন

Bata

বাড়ন্ত পায়ের নরম আরাম আর দুরন্ত পায়ের কড়া মজবুতি এই দুটি গুণ আছে বলেই বাটার ইস্কুলের জুতো সবার সেরা।

ওয়েফাইন্ডার্স ১৭
সাইজ ৯-১১, ১২-১, ২-৬
টা. ২৪.৯৫, ২৮.৯৫,
৩২.৯৫

কমেট ৭৩
সাইজ ৯-১১½, ১২-১½, ২-৫
টা. ২৩.৯৫, ২৬.৯৫,
৩০.৯৫

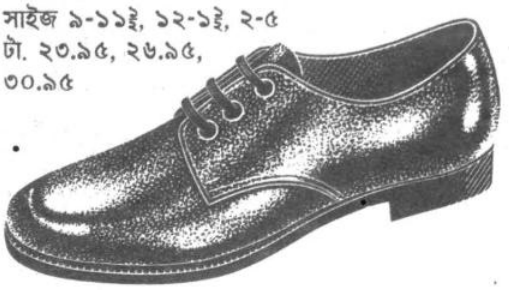

কড়া মজবুতি, নরম আরাম।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র, বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) ই-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭

আনন্দমেলা

আষাঢ় ১৩৮৪ জুন ১৯৭৭ তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা দেড় টাকা

ছড়া আগুন, আগুন । অন্নদাশঙ্কর রায় ২৮
অন্যায় । প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪
উল্টোরথ । বিমল ঘোষ (মৌমাছি) ৪৬

গল্প হাওয়া-বদল । আশাপূর্ণা দেবী ৫
ব্ল্যাকি। সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় ১৮

উপন্যাস বন্ধ ঘরের আওয়াজ । সমরেশ বসু ১১
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩৮

বিশেষ রচনা প্রজাপতি, প্রজাপতি । রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩
ল্যাংড়া আমের গল্প । রাধাগোবিন্দ মাইতি ৪৭

আরও ছড়া ভালই হল । রেবন্ত গোস্বামী ৬, দুটি ছড়া । এ সি সরকার (জাদুকর) ৪৬

কমিকস নোলেদা । অহিভূষণ মালিক ৪, মেরু-রহস্য ১৫, টিনটিন ৩২, গাবলু ৪৫

লেখাপড়া সেন্ট মার্গারেটস স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন ৩৪
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৩৫

খেলাধুলো বেটন জিতল মোহনবাগান । শ্রীখেলোয়াড় ৪৮
ওভারবাউন্ডারির রাজা । পুষ্পেন সরকার ৪৯
বিখ্যাত তিন ক্রিকেটার । দ্বাদশ ব্যক্তি ৫১, শতবর্ষের উইম্বলডন । চিরঞ্জীব ৫৩
রমেশ কি তার বাবার মতো খেলবে । সুব্রত সরকার ৫৫

ধাঁধা-মজা-রহস্য আটখানা ৩০, ধাঁধা ৩০, কিসের ফটো ৩১, কিসের ছবি ৩১, শব্দ-সন্ধান ৩১

অন্যান্য লেখা মজার পড়া । কুন্তক ১৭, ডোডো-তাতাই। তারাপদ রায় ২৬
বিশ্ব-বিচিত্রা । দিদিমণি ২৬, তোমাদের পাতা ২৭
ম্যাজিক । জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র ৪৩, আচ্ছা বলো তো । ভানুমতী ৪৪
মণিমেলার খবর ৪৪, আঁকো । রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮, শেখো । কারিগর ৫৮

রঙিন ছবি পোকা থেকে প্রজাপতি ২৪, ২৫
মোহনবাগানের ফুটবল-ক্যাপ্টেন সুব্রত ভট্টাচার্য ৫৬
ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল-ক্যাপ্টেন শ্যামল ঘোষ ৫৭

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

নোলেদা চালতাডাঙার দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার

চালতাডাঙা ফুটবল ক্লাব মাঠে নেমেই ট্যাংরাপোঁতার কাছে গোল খেয়ে গেল

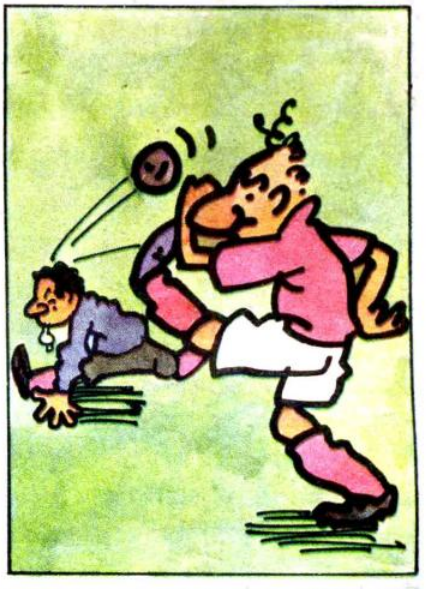

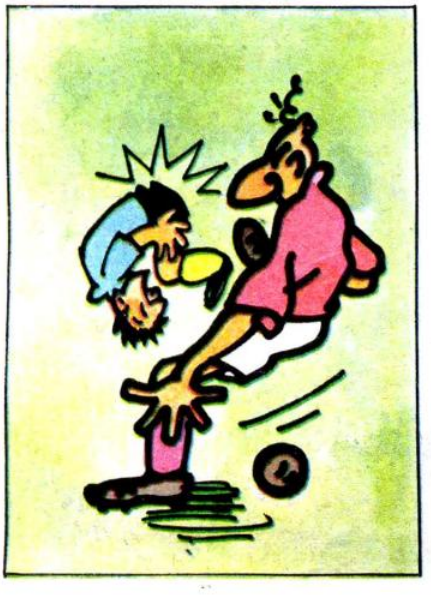

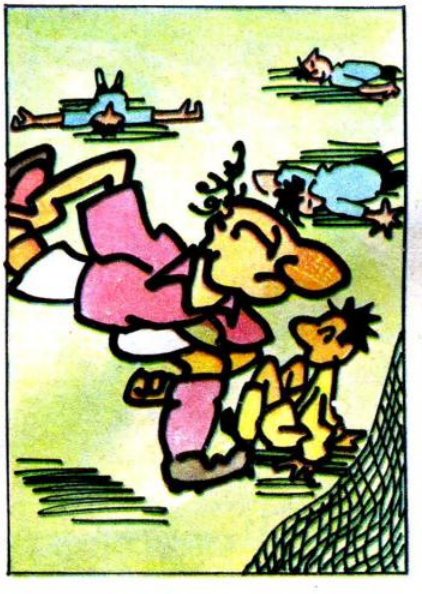

হাওয়া বদল

আশাপূর্ণা দেবী

গ্রামের জ্ঞাতি কবরেজ-ঠাকুর্দা, কলকাতার নাতি নিমাইচরণের বাড়িতে এসে দাঁড়ানো মাত্রই প্রায় ধিক্কারের গলায় বলে উঠলেন, "কী রে নিমে, সংসারের সব মালপত্তর শুধু নিজের পেটেই চালান করিস? ছেলেমেয়েগুলোকে স্রেফ হাওয়া খাইয়ে রাখিস?"

এই অভাবিত আক্রমণে নিমাইচরণ থতমত খেয়ে বলেন. "তার মানে?"

"মানে? মানে জিজ্ঞেস করছিস?" কবরেজ-ঠাকুর্দা জোর গলায় বলেন, "বাড়িতে বড় আয়না নেই? একবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে এসে ছেলেপেলেগুলোর দিকে তাকা। মানে বুঝতে পারবি। অ্যাঁ! কী কাণ্ড! নিজের ভুঁড়ির ওপর থাক-থাক বাড়তি তিন থাক ভুঁড়ি, আর ওগুলো একেবারে শ্বেত-চামচিকে। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। চামচিকেরও অধম। কাঠঠোকরা, পাট-কাঠি, ফড়িং।"

এমন অপমানে কার না রাগ হয়?

তার ওপর আবার ওই শ্বেত-চামচিকে কাঠঠোকরা, পাটকাঠি আর ফড়িংরা কবরেজ-ঠাকুর্দার সামনেই বাবার সেই 'তিন থাকের' দিকে দৃষ্টিপাত করে একযোগে হাসি চালিয়ে যাচ্ছে। হি হি হি হি। খি খি খি খি।

পিত্তি জ্বলে গেল।

ক্রুদ্ধ নিমাইচরণ উত্তেজিত হলেন।

এই ছেলেমেয়েদের জন্যেই প্রাণপাত করছেন তিনি, আর কিনা এমন অপবাদ! রেগে বলেন, "আমায় বোলো না ওসব, ওদেরই বলো। না-খেলে কখনো কারুর শরীর সারে? ওদের মা তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাওয়া-খাওয়া করে ওদের পিছু-পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে, তা খাচ্ছে কে? খেতে বললেই তো তেড়ে মারতে আসে—"

শুনে কবরেজ-ঠাকুর্দা চমকে উঠে বলেন, "অ্যাঁ! বলিস কী? খেতে বললে তেড়ে মারতে আসে? এ যে একটা দারুণ ব্যাধি! আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে একে বলে "প্রাকোন্মাদ রোগ"। সব কটার একসঙ্গে! ইস! নিমেরে, তোর কপালে—"

কথার মাঝখানে নিমাইচরণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "আহা, সত্যি কি আর মারতে আসে? মানে খিদে নেই, তাই খেতে চায় না।"

তা খিদেই বা নেই কেন?

কবরেজ-ঠাকুর্দা ভুরু কুঁচকে নাকে নস্যি ঠুশতে ঠুশতে ৫

বলেন, "এ বয়েসে তো 'ঘর খাই বাড়ি খাই. ইঞ্জিন খাই রেল-গাড়ি খাই' খিদে হবার কথা! নাঃ বাপু, এও এক প্রকার ব্যাধি। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে একে বলে—"

এখন নিমাই-গিন্নী এক গেলাস মিছরির শরবত এনে কবরেজ-ঠাকুর্দার সামনে ধরে দিয়ে বলেন, "তা আপনার আয়ুর্বেদ-শাস্তর থেকে একটা-কিছু ওষুধ দিন না ঠাকুর্দা. যাতে খুব খিদে হয়। নেই তেমন ওষুধ?"

কবরেজ-ঠাকুর্দা চড়া গলায় বলেন, "পৃথিবীতে এমন ব্যাধি নেই, আয়ুর্বেদে যার ওষুধ নেই। নেহাত নাকি দাঁত গেলে দাঁত বাঁধাবার ব্যবস্থাটা নেই, তাই তোমাদের ওই এলোমেলো-প্যাথির শরণাপন্ন হতে কলকাতায় আসা। থাক না এক্ষুনি বৃহদারণ্যক বটিকা. 'খিদে খিদে' করে পাগল করে দেবে তোমায় ছেলেমেয়েরা।"

নিমাই-গিন্নী ব্যস্ত হয়ে বলেন, "তবে তাই চারটি দিন বাপু! আছে সঙ্গে?"

"এই দ্যাখো পাগলের কথা! ওষুধ কি আমি সঙ্গে নিয়ে বেড়াই? তবে হ্যাঁ, উপকরণগুলো জোগাড় করে দিলে বানিয়ে দিতে পারি।"

"তবে বলুন তাই, কী কী লাগবে।"

নিমাই-গিন্নী আশা-ভরসা-মাখা মুখে তাকান কবরেজ দাদা-শ্বশুরের মুখের পানে। ঠাকুর্দা গড়গড় করে বলে যান, "বুড়ো বটগাছের ছাল এক তোলা, শুকনো পিপুলের ছাল এক তোলা, প্রাচীন ছাতিম গাছের বাকল দেড় তোলা, দেবদারু কাণ্ডের মূল পৌনে এক তোলা, শ্বেত করবীর শেকড় সিকি তোলা, চন্দনের গুঁড়ো আড়াই তোলা, গোধূম ও কৃষ্ণতিলচূর্ণ সওয়া তোলা. অর্জুনছাল আধ তোলা, অনন্তমূল শুষ্ক সওয়া তোলা. জম্বুবৃক্ষের বাকল চার তোলা. নিম্বফল ভস্ম সওয়া তিন তোলা আর মধু পাঁচ তোলা একত্রে নিয়ে—"

নিমাই-গিন্নী কাতর মুখে বলেন, "শহরে বসে এত সব জোগাড় করা কি সম্ভব ঠাকুর্দা?"

ঠাকুর্দা উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, "এত সব কী গো নাতবৌ? তবু তো ঝাঁটি-করবীর কথা বলতে ভুলেছি। 'বৃহদারণ্য বটিকা' মানে হচ্ছে একটি বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে যত প্রকার ওষধিবৃক্ষ আছে তার নির্যাস বার করে নিয়ে—"

"বুঝলাম তো," নিমাই-গিন্নী আরও কাতর মুখে বলেন, "মানছিও। কিন্তু অতসব চিনবেই বা কে? আনবেই বা কে? ওর চেয়ে সহজ কিছু নেই?"

"ওর থেকে সহজ?" কবরেজ ঠাকুর্দা বলে ওঠেন, "হুঁ! রাংতায় মোড়া ট্যাবলেটগুলোকে ওষুধ বলে গিলে-গিলে অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে তো, তাই এই কটা জিনিস জোগাড় করাটা বিরাট একটা শক্ত কাজ মনে হচ্ছে। তা বেশ. সহজ চাও তো হাওয়া বদলাতে যাও। ওই অরণ্যঘেঁষা কোনো জায়গায়। ওর চাইতে সহজ ওষুধ আর নেই।"

সহজ! সেরেছে!

এখন নিমাইচরণ চমকে ওঠেন. "হাওয়া বদলটা তোমার সহজ মনে হল ঠাকুর্দা?"

"তা হবে না? ওতে তো আর এত সব জোগাড়ের দরকার নেই। একটাই মাত্র জোগাড়—ট্রেনের টিকিট! তা মাসখানেক আগে থাকতে চেষ্টা কর্। ব্যস, পেলেই চলে যা।"

নিমাইচরণ রেগে বলেন, "চলে যা বললেই চলে যাওয়া হবে?"

কবরেজ-ঠাকুর্দা পাকা ভুরু নাচিয়ে বলেন, "তা কি আর হয় রে নিমে? হওয়ালে তবে হয়। তবে পয়সা খরচের ভয়ে যদি তুই ছেলেমেয়েগুলোকে প্যাকাটি করে রেখে দিস, টাকা নিয়ে করবি কী?"

পয়সা খরচের ভয়ে!

নিমাইচরণ পয়সা খরচের ভয় পান? রাগে দুঃখে বেচারী মুখটা পেঁচা করে বলেন, "সময় কোথা? ছুটি কোথা?"

কবরেজ-ঠাকুর্দা চোখ কপালে তুলে বলেন, "ছুটি নেই? সরকারি অফিসে তো শুনেছি ছুটি জমে যায়।"

নিমাইচরণ মুখটাকে পেঁচার পেঁচা তস্য পেঁচা করে বলেন, "শুধু জমে যায় কেন, পচেও যায়। কিন্তু শুধু আমি ছুটি পেলেই হবে? ছেলেমেয়েদের ছুটি চাই না? তাদের সারা বছরে সাতান্ন দফা পরীক্ষা নেই? স্পোর্টস নেই? গানের ক্লাস নেই? নাচের প্রোগ্রাম নেই? সাইকেল রেস নেই? ক্যারম কম্পিটিশান নেই? খেলা দেখতে যাওয়া নেই? দাদামণির আসরে গল্প বলা নেই? পাড়ার ফাংশানে যোগ দেবার দায়িত্ব নেই? পাড়ার পুজোর চাঁদা তোলা নেই? 'সামনে বসে আঁকো' নেই? 'কাছে বসে লেখো' নেই? 'যে যা খুশি সাজো' নেই? হ্যানো নেই? ত্যানো নেই? এটা নেই? ওটা নেই? এর মাঝখানে কোন ফাঁকে নাক গলাব আমি বলো?"

কিন্তু শুনতে-শুনতে কপাল টিপে সোফায় বসে পড়েছেন ঠাকুর্দা, এখন আস্তে নিশ্বাস ফেলে বলেন, "এ যে বৃহদারণ্যকের জ্যাঠামশাই! কটা ছেলেমেয়ে তোর নিমে?"

নিমাইচরণ রেগে বলেন, "কটা আবার কী? জানো না তুমি? এখুনি প্রণাম করে গেল তোমায়! নিলু, ভোম্বল, মিমি, টুসকি, এই তো।"

"আমিও তো তাই জানতাম।" কবরেজ-ঠাকুর্দা বলেন, "কিন্তু তোর এই ফিরিস্তি শুনে মনে হচ্ছে বোধহয় আরও ডজনখানেক আছে ভেতরে। চারটেতেই এত?"

নিমাইচরণ গম্ভীর হন।

বলেন, "ওই চারেই চারশো ঠাকুর্দা! এ তোমার আমার যুগ নয়, এ হচ্ছে রকেটের যুগ! এত সব না-করতে পারলে সমাজে মুখ থাকে না!"

ঠাকুর্দা মিছরির শরবত শেষ করে গেলাস নামিয়ে রেখে বলেন, "তা মুখটা রাখছে কিসের জোরে? এদিকে তো ধুঁকছে!"

নিমাইচরণ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, "ওই ধুঁকে-ধুঁকেই খেলছে, ছুটছে, নাচছে, গাইছে, আঁকছে, লিখছে, বলছে, কইছে আর দু'দিন ছাড়া পরীক্ষা দিচ্ছে।"

কবরেজ-ঠাকুর্দা দু'হাত কপালে জোড় করে বলেন, "ধন্য ধন্য! তবু বলি বাপু, এতটা ঠিক নয়। কাপড়-জামাকে সময়-সময় যেমন ধোবাবাড়ি ঘুরিয়ে ফর্সা করে আনতে হয়, শরীরটাকেও তেমনি মাঝেমধ্যে হাওয়া বদলে ফ্রেশ করে আনতে

ভালই হল

রেবন্ত গোস্বামী

কালকে গেল এক ফাঁড়া,
করল যে এক ষাঁড় তাড়া—
ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেলাম
গড়চা থেকে পাকপাড়া।
ভাবছি এখন—ভালোই হল,
বাঁচল আমার বাসভাড়া।

হয়। আমি বলি একবার বদ্যিনাথ ঘুরে আয়! আহা আমি একবার গিয়েছিলাম! জল-হাওয়ার তুলনা নেই। সে কী খিদে পাওয়া! চব্বিশ ঘণ্টা খিদে পাচ্ছে। মাঝ-রাত্তিরে ঘুম ভেঙে উঠে মনে হচ্ছে, কী খাই কী খাই! একটা রাতে সে এক কাণ্ড! ঘরে কিছু নেই, অথচ দারুণ খিদে! ঝুড়িতে ছিল কপি আর আলু, তোদের ঠাকুমা আর আমি তাই খেতে লেগে গেলাম নুন দিয়ে দিয়ে! মনে হল অমৃত খাচ্ছি।"

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে চার-চারটে ছেলেমেয়ের গলা থেকে একসঙ্গে হি হি হি হি হাসির শব্দ ভেসে আসে।

কবরেজ-ঠাকুর্দা বলেন, "হাসলে কী হবে? গিয়ে দ্যাখ না! আমি বলছি নিমে, তুই একবার বদ্যিনাথ চলে যা। তোর ছেলে-মেয়েদের অখিদে অগ্নিমান্দ্য দুদ্দাড়িয়ে পালাতে পথ পাবে না। যে করে হোক, ছুটি-ফুটি নিয়ে চলে যা একবার।"

তা শেষ পর্যন্ত হাওয়া-বদলই ঠিক হল।

নিমাইচরণ অবশ্য প্রথমটায় ভেবে আকুল হচ্ছিলেন। চেনা-জানা নেই, কোথায় গিয়ে উঠব ঠিক নেই. কিন্তু হয়ে গেল ম্যানেজ।

নিমাইচরণের এক বন্ধুর জামাইয়ের পিসেমশাইয়ের দেওঘরে একটা বাড়ি আছে, বলা-কওয়া করে তার চাবিটা পাওয়া গেল। অতএব একদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে রওনা দিলেন নিমাইচরণ তাদের বাষট্টি দফা কার্যসূচী থেকে ফাঁক বার করে।

শেষ মুহূর্তে এক দুঃখের ঘটনা ঘটায় নিমাই-গিন্নীর যাওয়া হল না। ঠিক এই দিনেই কিনা তাঁর দিদিমার কানের ফোঁড়া পেকে উঠল, সেই 'অপারেশন কালে' দিদিমার নাতনী কাছে থাকবেন না?

তা ছেলেমেয়েরা এতে খুশি বৈ অখুশি হয়নি।

ওরা মায়ের কান বাঁচিয়ে চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, "একরকম ভালই হল বাবা! মা তো সেই সদা-সর্বদা 'খাওয়া খাওয়া' করে পিছু-পিছু ধাওয়া করত! এ বেশ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে বেড়িয়ে বেড়ানো যাবে।"

বেশ নিশ্চিন্তেই এসে হাজির হল ওরা।

যদিও সঙ্গে মোটঘাট বিস্তর।

শুধুই তো জামা-কাপড় বাসন-পত্র খাবার-দাবারই নয়, চার ভাইবোনের পড়ার বইয়ের পাহাড়, গল্পের বইয়ের হিমালয়, দশ-বিশ দফা ইনডোর গেম-এর সরঞ্জাম, তানপুরা, হারমোনিয়াম, রেকর্ড প্লেয়ার, ক্যামেরা, সাজবার বাক্স নিমাইচরণের জানা-অজানা কত কী, তার ঠিক নেই। ছখানা রিকশা বোঝাই করে এগোলেন নিমাইচরণ সেই বাড়িখানির উদ্দেশে, যে বাড়ির চাবি আর ঠিকানা সঙ্গে এনেছেন।

কিন্তু রাস্তা আর ফুরোতেই চায় না।

কোথায় বাড়ি করে রেখেছেন বন্ধুর জামাইয়ের পিসেমশাই?

যাক. শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।

একেবারে নন্দন পাহাড়ের কোলে।

বাড়ি প্রকাণ্ড! কত যে ঘর দালান বারান্দা গেট! দেখে শুনে যেন দিশেহারা। এতবড় জগদ্দল বাড়ি কী উদ্দেশ্যে বানায় লোকে? যা বানিয়ে তারপর ফেলে রাখতে হয়? দেখা গেল চাবিটা কষ্ট করে না-আনলেও চলত। অনেকগুলো জানলাই দরজা হয়ে গেছে। খোলা দরজা।

তালাটায় দারুণ মরচে ধরার দরুন চাবি ঢুকল না। তবে তাতে কিছু এসে গেল না, ওই একটা জানলা-কাম-দরজা দিয়েই ঢুকে পড়া গেল।

কিন্তু ভিতরের অবস্থা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে

পড়লেন নিমাইচরণ। তবে ছেলেমেয়েদের তাতে উৎসাহ-উল্লাসে ঘাটতি পড়ে না।

তারা কেউ ভাঙা নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে ছাতে উঠে যায়, কেউ বাগান দেখতে বেরোয়, কেউ বা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। নিমাইচরণ তাকিয়ে দেখেন না।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ খেয়াল হল নিমাইচরণের, বড্ড যেন চুপচাপ! কেউ কোথাও নেই। রিকশাওলাগুলোকেই বা ভাড়া মেটাল কে?

উঠে পড়ে হাঁক দিলেন, "নিলু ভোম্বল মিমি, টুসকি!"

শেষের দু'জন দুদ্দাড়িয়ে ছাত থেকে নেমে এল।

নিমাইচরণ বললেন, "রিকশাওলাদের ভাড়া মেটাল কে?"

ওরা দুজনেই বলে উঠল, "এ মা, আমরা কী জানি? তুমি দাওনি ভাড়া?"

কিন্তু দিলে কি আর জিজ্ঞেস করতে আসতেন নিমাইচরণ? সে দুটো কোথায় গেছে? নিলু আর ভোম্বল?

"দাদা ছোড়দা? কে জানে? বোধহয় অরণ্যের হাওয়া লাগাতে বেরিয়েছে।"

নিমাইচরণ কড়া গলায় বলেন, "সন্ধে হয়ে আসছে, আর এই নতুন জায়গায়! যত সব—"

"ছোড়দার পকেটে টর্চ আছে বাপি।"

নিমাইচরণ থমকে বলেন, "টর্চ আবার কোথায় পেল?"

"আসার আগে চোদ্দ টাকা দিয়ে কিনে এনেছে।"

নিমাইচরণ গুম হয়ে বলেন, "তা কিনবে বইকি! পয়সা খোলামকুচি!"

সঙ্গে সঙ্গেই ভোম্বলের গলা।

"খোলামকুচির কথা কী হচ্ছে বাপি?"

ভোম্বলের পিছনে নিলু।

"কিছু না। বলছি, রিকশাওলাগুলো যে হৈচৈ করল না, ভাড়া মিটিয়ে দিল কে? তোরা?"

"ভাড়া? আমরা? আমরা টাকা কোথায় পাব?"

আকাশ থেকে পড়ে ওরা, "তুমি আমাদের কাছ থেকে সকলের সব টাকা তোমার অ্যাটাচিকেসে পুরে নিয়ে নিজের

কোলে চাপিয়ে বসলে না? পাছে আমাদের পকেটমার হয়ে যায় বলে?”

কথাটা সত্যি।

তা-ই করেছিলেন নিমাইচরণ, নিজের কোলটা সব থেকে সেফ জায়গা ভেবে।

কিন্তু জিনিস কোলে নিয়ে তো আর রিকশা থেকে নামা যায় না? চাবি খোলার সময়ও (মানে খোলবার চেষ্টার সময়) কিছু আর হাতে জিনিস থাকলে চলে না?

অতএব মনে হচ্ছে, অ্যাটাচিকেসটি সেই বিরাট মাল-পত্তরের পাহাড়ের মধ্যেই পড়ে আছে, আর বেচারী রিকশাওলারা বাবুদের ডেকে-ডেকে আর চেয়ে-চেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

টুসকি বলে, “আহা! কত কষ্ট করে এতদূর আনল বেচারারা! তুমি কিন্তু বাপি বড্ড নিষ্ঠুর। তক্ষুনি দিয়ে দেবে তো? চা খেতেও পয়সা দাওনি?”

কিন্তু দেবেন কখন?

তারা তো কোনো সাড়াই করেনি।

নিলু বলে, “ঘাবড়াতে হবে না, ঠিকই আসবে। আজ না হোক কাল সকালে। পাওনা ফেলে যাবে কোথায়? এখন একটা আলোটালো জ্বালানো হোক। হারিকেন-ফারিকেনগুলো কই?”

নিমাই ক্লান্ত গলায় বলেন, “সবই একসঙ্গে আছে বাবা. নিয়ে এসে জ্বাল্। আর অ্যাটাচিটা আমায় দিয়ে যা।”

দেবে তো, কিন্তু কোথা থেকে?

জিনিসের সেই হিমালয় পর্বতটি কোথায় নামানো হয়েছে? কোন গেটের ধারে? কোন দালানে?

টর্চ নিয়ে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে আসে নিলু-ভোম্বল। নেই। কোনো দালানে নয়, কোনো গেটের ধারে নয়।

তার মানে তারা রিকশা থেকে নামেইনি।

তিনখানা রিকশায় মানুষ ছিল, তিনখানায় মাল। মানুষরা নিজেরা লাফিয়ে-লাফিয়ে নেমে পড়েছে। মালপত্রের তো আর সে-ক্ষমতা নেই, তাই তারা বসেই থেকেছে।

রিকশাওলারাও আর কষ্ট করে না নামিয়ে আবার তাদের বয়ে-বয়েই উল্টোমুখো ফিরে গেছে।

তার মানে—দ্বিতীয়বার পরবার মত জামাটামা কিছু নেই; খাবারটাবার কিছু নেই, শোবার কিছু নেই, খেলবার, পড়বার শোনবার, লিখবার, আঁকবার, সাজবার, বাজাবার কিছু না কিছু না।

টুথব্রাশ? সাবান? বালতি? মগ?

না না! সব ফর্সা!

সব অভাব মিটোতে পারার মন্ত্রটি যার মধ্যে, সেই অ্যাটাচি-কেসটিও তাই! ফর্সা। হয়তো সে এখন কোনো এক রিকশা-ওলার কোলে চেপে বসে আছে।

নেহাত নাকি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কাঁদা যায় না, তাই সবাই গুম হয়ে বসে থাকে। বসেই থাকতে হয়, শোবার তো উপায় নেই।

হঠাৎ এক সময় নিমাইচরণ কাঁদো-কাঁদো হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, “তোদের মায়ের সেই অতো যত্ন করে দেওয়া খাবারটা পর্যন্ত—”

ভোম্বল আর নিলুও চেঁচিয়ে ওঠে রেগে। “আমাদের যথা-সর্বস্ব গেল বাপি, আর তুমি সেই লুচি-তরকারির শোকে কেঁদে ফেলছ?”

“তা কী খাবি তোরা? একটা পয়সা পর্যন্ত নেই যে দোকান থেকে কিছু—”

“খাওয়াটাই বড় কথা নয় বাপি। ওটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। যা সব চলে গেল! উঃ! ভাবা যায় না!”

মিমি-টুসকি ভাঙা গলায় বলে, “মায়ের সঙ্গে মিশে-মিশে

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিন্ত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিন্ত করতে আমাদের যে কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

আমাদের ৫০০০৲ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২৫ বছর পরে আপনি পাবেন ৬০,২৮৫.৬০ টাকা। তাছাড়া রয়েছে আমাদের ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট, এণ্ডাওমেণ্ট বেনিফিট ডিপজিট, মাসিক আয় সার্টিফিকেট, রেকারিং ডিপজিট এ্যাকাউণ্ট প্রভৃতি নানা সঞ্চয় প্রকল্প।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৭, রেড ক্রস প্লেস

কলিকাতা-৭০০০০১ ● টেলিফোন ঃ ২৩-৯৭৮৪ (৩টি লাইন)

॥ অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস ॥

Progressive/UIB

ব্যাপিরও মায়ের মতন স্বভাব হয়ে গেছে। সব ছাপিয়ে শুধু খাবার চিন্তা! আমার সেই বইগুলো! না খেয়ে বরং সাতদিন সাতরাত থাকা যায় কিন্তু গল্পের বই না পড়ে? অসম্ভব! বাপি. আমি মরে যাব, ঠিক মরে যাব।"

আলো নেই, তাই কেউ কারুর মুখ দেখতে পায় না. শুধু মাঝে মাঝে টর্চ জেবলে দেখা হচ্ছে সবাই আছে কিনা।

কী না থাকতে পারে এ-বাড়িতে?

ভূত, চোর, বাঘ, সাপ!

এ রাত কি কাটবে?

টুসকি বলে ওঠে, "কাল ভোরের গাড়িতেই ফিরে চলো বাপি।"

নিমাইচরণ গম্ভীরভাবে বলেন, "কী দিয়ে? বিনা টিকিটে?"

নিলু বলে ওঠে, "মাকে টেলিগ্রাম করে দাও টি-এম-ও করে টাকা পাঠিয়ে দিতে।"

নিমাইচরণ আরো গম্ভীর গলায় বলেন, "টেলিগ্রামও অমনি করা যায় না।"

"তাহলে? কার হাতে কী আছে?"

কিছু না। ছিনতাইয়ের ভয়ে নিমাইচরণ ছেলেমেয়েদের ঘড়ি আংটি কানফুল হার বালা সব কলকাতায় রাখিয়ে এসেছেন।

শেষ পর্যন্ত থাকার মধ্যে এই টর্চটি।

নিমাইচরণ পাথর-পাথর গলায় বলেন, "ওটাকেই পোস্ট অফিসে জমা রেখে অবস্থা জানিয়ে বিনা পয়সায় টেলিগ্রাম করতে হবে। ...তার মানে ওটাই এখন বিপদতারণ।"

টুসকি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে. "কাল রাত্তিরের আগে টাকা এসে যাবে?"

"পাগল?"

"তাহলে কাল রাত্তিরে কী হবে বাপি? টর্চটাও থাকবে না?"

নিমাইচরণ নিশ্বাস ফেলে বলেন. "একটা দেশলাই চেয়ে আনব কারো কাছ থেকে।"

সকালবেলা উঠে পড়েই বেরিয়ে যান টর্চটা নিয়ে। পোস্ট অফিসের উদ্দেশে।

কিন্তু নিমাইচরণের তাড়া আছে বলে তো আর পোস্ট মাস্টার ভোরবেলা অফিস খুলে বসে নেই? টর্চ জমা রেখে টেলিগ্রাম করে দিয়ে চেয়েচিন্তে একটি দেশলাই জোগাড় করে হাটতে হাঁটতে ফিরে এলেন অনেক বেলায়।

হাঁটা ছাড়া উপায় কী?

রিকশ? অমনি চড়াবে? হায় কালকের সেই ছ'খানার এক খানাও যদি চোখে পড়ত? কিন্তু চোখে পড়লেই কি চিনতে পারতেন? কে ওদের মুখ মনে করে রাখে?

রোদ চড়চড় করছে। যে-কোনো একটা খোন্দল দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। সারা বাড়ি সুনসান, চুপচাপ। ছেলেমেয়েগুলো গেল কোথায়?

নিমাইচরণ ভাঙা-ভাঙা ভয়-ভয় গলায় ডাক দিলেন. "মিমি. টুসকি!"

কোন্ একটা ঘর থেকে টুসকি বেরিয়ে এল, উৎফুল্ল হাসি-হাসি মুখে।

নিমাইচরণ ভাবলেন, আহা, আমার যদি ওদের মত ধাত হত! কাল থেকে উপোস চলছে। আমার তো পেটের মধ্যে রেল-গাড়ির হুইসল বাজছে, কাকচিল ডানা ঝাপটাচ্ছে, ছুঁচোয় ডন্ বৈঠক করছে, অথচ এরা? এখনো হাসি মুখ! বোধহয় ক্যারমে জিতেছে।

পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে এগিয়ে দিয়ে বলেন. "এই নাও তোমার দেশলাই।"

টুসকি কাছে এসে বলে ওঠে, "ইস বাপি, এটার বদলে যদি একটু নুন আনতে গো!"

"নুন!

"হ্যাঁ বাপি! আমরা না এই বাড়ির বাগানে একটা অদ্ভুত খাবার জিনিস পেয়ে গেছি, ইয়া বড়। সবাইয়ের পেট ভরে যাচ্ছে, শুধু যদি একটু নুন থাকত। আরও ভাল লাগত।"

নিমাইচরণ ভয় পেয়ে বলেন, "বাগান থেকে কী আবার খেতে গেলি? বিষাক্ত নাকি ? দেখি—"

দেখেন গিয়ে।

চার ভাই বোনে বৃহৎ কী একটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কামড়ে-কামড়ে খাচ্ছে। কী করবে? ছুরি তো নেই। বঁটি-কাটারি কিছুই না।

কিন্তু কী ওটা?

নিমাইচরণ অবলোকন করেন, একটি হৃষ্টপুষ্ট বৃহৎ লাউ।

নিমাইচরণ চেঁচিয়ে উঠে বলেন. "কোথায় পেলি এটা?"

"জঙ্গলের ধারে—শশা কি পেয়ারা-টেয়ারা খুঁজতে গিয়ে হিজিবিজির মধ্যে আবিষ্কার করলাম বাপি।"

নিমাইচরণ কেঁদে ফেলে বলেন, "কাঁচা লাউ খাচ্ছিস তোরা?"

ওরা এক মুখ লাউ সমেত এক মুখ হেসে বলে. "ফার্স্ট ক্লাস খেতে বাপি! ঠিক কচি শশার মতনই। একটু যদি নুন থাকত! আঃ! মার্ভেলাস! বাপি, তুমি একটু খেয়ে দেখলে বুঝতে!"

নিমাই-গিন্নী আকাশ থেকে পড়ে বলেন. "তোমরা চলে এলে যে?"

নিমাইচরণ গম্ভীরভাবে বলেন. "চলে আসার জন্যেই তো টাকা পাঠাতে বলা হয়েছিল।"

শুনে ভদ্রমহিলা 'নেই'।

তিনি ভাবছিলেন. ওখানে বোধহয় কোনো কিছু মজার জিনিস পাওয়া যাচ্ছে শস্তা-শস্তা। তাই টাকার দরকার।

"তা অত টাকা যে সঙ্গে নিয়ে গেলে?"

"ফুরিয়ে গেছে। বৃহদারণ্যক হাওয়ার গুণে!"

নিমাই-গিন্নীর ইচ্ছে ছিল দিদিমা একটু সেরে উঠলেই তিনিও চলে যাবেন। তা নয়, এরাই চলে এল। ধ্যাৎ! বেজার গলায় বললেন, "তা এই তিনদিনের মধ্যে চলে আসা হল কেন?"

নিমাইচরণ গম্ভীরভাবে বলেন. "তিনদিনেই যখন উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল, ফর নাথিং বসে থেকে লাভ? তোমার ছেলেমেয়ে-দের অখিদে অরুচি অগ্নিমান্দ্য সব সেরে গেছে। 'ঘর খাই বাড়ি খাই' খিদে! দেখগে যাও এতক্ষণে বোধহয় রান্নাঘরে গিয়ে বামুন ঠাকুরের মাথাটা খাচ্ছে।"

"বলো কী গো? হাওয়ার এমন গুণ? যাই, কবরেজ-ঠাকুর্দাকে লিখে দিই গে। তা তোমাদের মালপত্র?"

"মালপত্র?" নিমাইচরণ আরও গম্ভীর গলায় বলেন, "সে সব আর আনতে পারলাম কই? ঘরবাড়ি, রেলগাড়ি, ইঞ্জিন এ সব কিছু না পেয়ে ওইগুলোই শেষ করতে হয়েছে। এটাও লিখে দিতে পারো কবরেজ-ঠাকুর্দাকে।"

আসল কথাটি ফাঁস করবেন নাকি নিমাইচরণ? করলেই গিন্নী বলে বসবেন যে, তিনি যাননি বলেই এমন অঘটন।

যাক্ গে যাক জিনিস! কিনলে আবার হবে।

ছেলেমেয়েদের শক্ত ব্যাধির ওষুধটা তো আবিষ্কার করে ফেলা গেছে!

ছবি / অলোক ধর

শিশুদের—
কিশোরদের—
যত ছোটদের বই

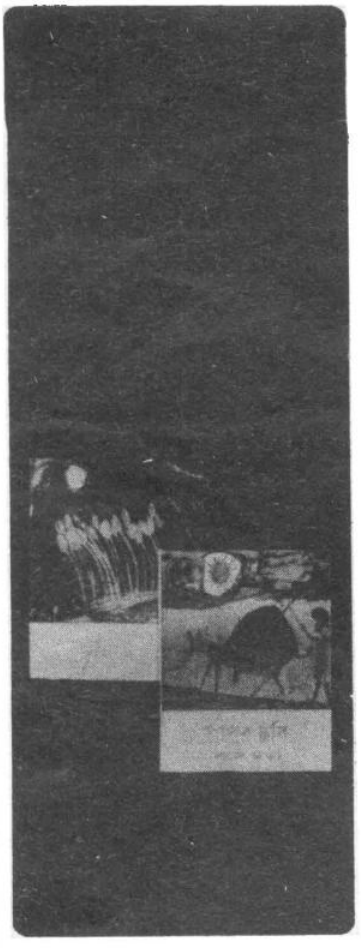

ডাক নাম পাপু—পোশাকী নাম সুব্রত সরকার। মাত্র আট বছর ন' মাস বেঁচে ছিল সে এই পৃথিবীতে। সেই পলকটুকুতে খেলাচ্ছলে এক আশ্চর্য কল্পলোকের দুয়ার সে খুলে দিয়েছিল দেশের আর-সব পাপুদের সামনে। দুরন্ত শিশু শিল্পীর নানা বয়সে নানা খেয়ালে আঁকা ও লেখা সেইসব ছবি, কবিতা, গল্প ও নাটকের সংকলন :

পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০

পাপুর বই ৬.০০

সত্যজিৎ রায়

বাদশাহী আংটি ৫.০০

এক ডজন গপ্‌পো ৮.০০

প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০

গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০

সোনার কেল্লা ৬.০০

বাক্স-রহস্য ৫ ০০

কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০

সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০

রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০

আরো এক ডজন ১০.০০

জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ছেলেদের বিবেকানন্দ ২.০০

সরলাবালা সরকার

পিনকুর ডাইরি ২.০০

সুকুমার রায়

সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০.০০

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫.০০

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০.০০

জীবজন্তু ৮.০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)

রাজার রাজা ৭.০০

শৈলেন ঘোষ

অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩.০০

মিতুল নামে পুতুলটি ৪.০০

ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬.০০

বাজনা ৫.০০

হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০

আমার নাম টায়রা ৫.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আমাদের নিবেদিতা ৬.০০

নকুল মুখোপাধ্যায়

দেবতার পাহাড় ৩.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আগ্রা যখন টলমল ৫.০০

যাঁর নাম ঘনাদা ৪.৫০

পার্থসারথি চক্রবর্তী

কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪.০০

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪.০০

রসায়নের ভেলকি ৩.০০

ম্যাজিকের মত মজা ৫.০০

ইন্দ্রমিত্র

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫.০০

শরৎ-কথামালা ১০.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভয়ের মুখোশ ৫.০০

পাথরের চোখ ৬.০০

সীমানা ছাড়িয়ে ৬.০০

পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০

পূর্ণেন্দু পত্রী

কী করে কলকাতা হলো ৪.০০

ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০

মতি নন্দী

ননীদা নট আউট ৪.০০

বুদ্ধদেব গুহ

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভয়ংকর সুন্দর ৪.০০

সত্যি রাজপুত্র ৫.০০

তিন নম্বর চোখ ৫.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী

নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০

গৌরকিশোর ঘোষ

দুষ্টুর দুপুর ৩.০০

আনন্দ বাগচী

বনের খাঁচায় ৫.০০

বিমল কর

ওআওার মামা ৬.০০

কাপালিকরা এখনও আছে ৭.০০

মনোজ বসু

ওস্তাদ নটবর ৬.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪.০০

লীলা মজুমদার

বাতাসবাড়ি ৪.০০

অমরনাথ রায়

দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০.০০

আশাপূর্ণা দেবী

রাজকুমারের পোশাকে ৪.০০

সমরেশ বসু

মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫.০০

অমিতাভ চৌধুরী

তেপান্তরের মাঠে ৩.০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী

চরকা বুড়ী ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

সমরেশ বসু

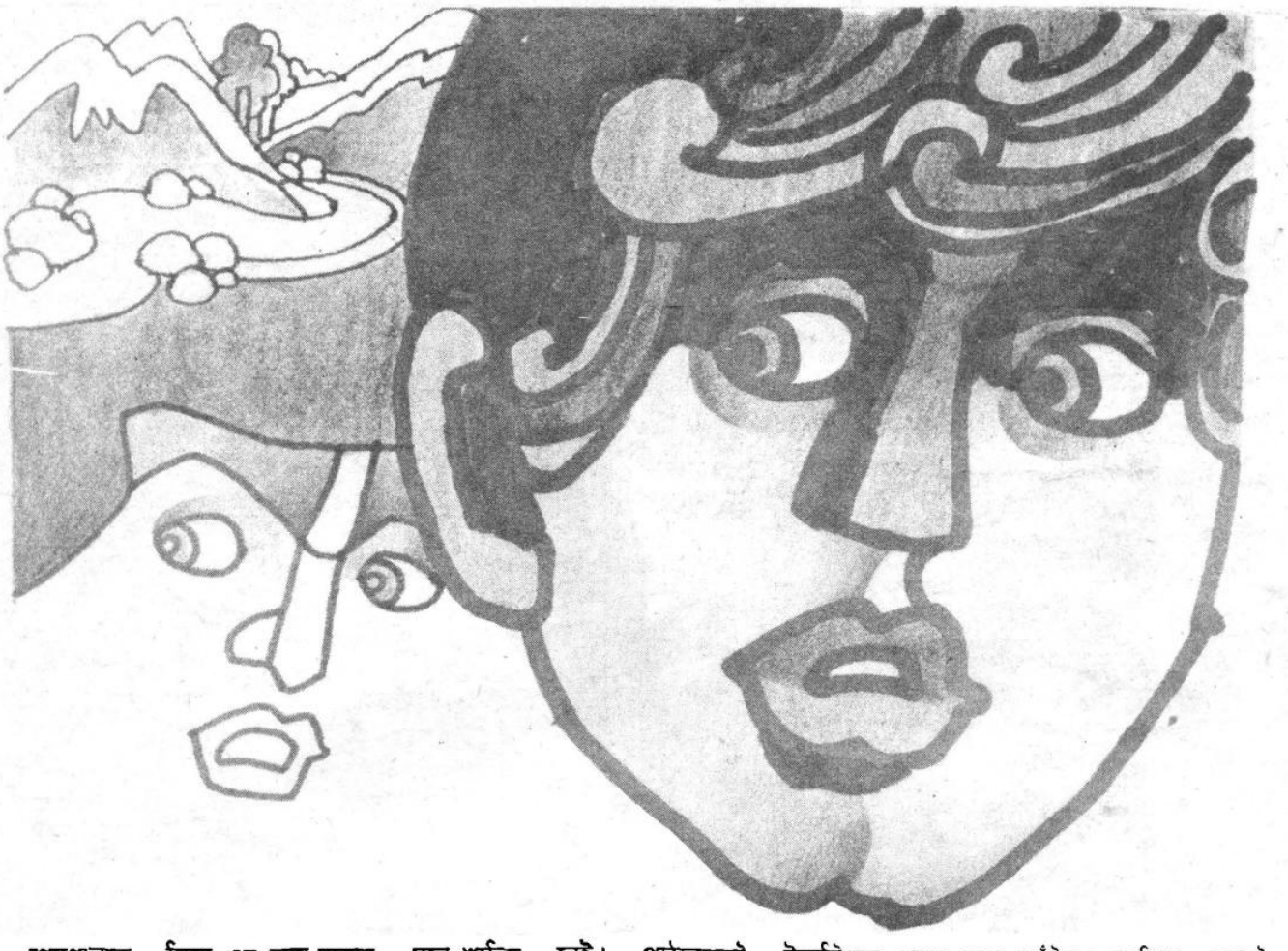

গোগোলকে নিয়ে ওর বাবা-মায়ের মনে শান্তি নেই। ইতিমধ্যেই সে এত সব কান্ড-কারখানা করে বসে আছে। শান্তি থাকবার কথাও নয়। আর গোগোলের সে-সব কান্ড-কারখানা দেশময় কারও জানতে বাকি নেই। কারণ ওর সব কান্ড-কারখানাই খবরের কাগজে ছেপে বেরিয়েছে। অথচ গোগোল মনে-মনে ভেবে অবাক হয়, ও আবার কী কান্ড-কারখানা করেছে? ও তো ইচ্ছে করে কিছুই করেনি। কতগুলো অদ্ভুত সব ঘটনা ওর চোখের সামনে ঘটে গিয়েছে। আর সেই সব ঘটনা দেখতে গিয়েই, এক একটা তুলকালাম কান্ড ঘটে গিয়েছে।

যেমন, বছর দুয়েক আগে, সামারের ছুটিতে, বাবা-মায়ের সঙ্গে কাশ্মীরে গিয়ে এক কান্ড ঘটেছিল। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে ও তাঁবুতে ছিল। যেদিকটায় পাইন-বন, ঘোড়ায় চড়ার মাঠ আর বেড়াবার লোকদের গাড়ি রাখবার জায়গা, ওর সেদিকটাতেই খেলতে যেতে ভাল লাগত। ও যখন কাশ্মীরে গিয়েছিল, তখন পাঞ্জাবে একটা বিরাট ব্যাংক-ডাকাতি হয়েছিল। অনেকেই সন্দেহ করেছিল, ডাকাতরা কাশ্মীরে পালিয়েছে। সেজন্য সারা কাশ্মীরে পুলিশ ও মিলিটারি ডাকাতদের খোঁজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কী, পাঠানকোট ইস্টিশনে ওদের বাক্স প্যাঁটরাও পুলিস ঘেঁটে দেখেছিল।

সে যাই হোক। গোগোল পাইনবনের ধারে খেলতে-খেলতে একদিন একটা গাড়ির পেছনে জোড়া লাগানো ট্রলারের মধ্যে ইঁদুরের খুটখুট আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। তারপরে দেখেছিল, লোহার চার দেওয়ালের ট্রলারে দুটো ফুটো। আর সেই ফুটোয় মানুষের চোখ। মজা লাগত, ও ট্রলারের কাছে গেলেই ইঁদুরের খুটখুট আওয়াজ থেমে যেত। বাবা-মাকে এসব কথা বলায়, তাঁরা মোটেই কান দেননি। গোগোলের সঙ্গে একজনের খুব ভাব হয়েছিল। তাঁবুওয়ালাদের রান্নাঘরের রসুইকরের সঙ্গে। ট্রলারের ভেতরে খুটখুট আর ফুটোয় মানুষের চোখের কথা ও তাকে বলেছিল। সে গোগোলকে কোলে চাপিয়ে পাহাড়ের নীচে একেবারে পুলিসের অফিসে নিয়ে গিয়েছিল। তারপরেই পুলিস গাড়ি আর ট্রলারটাকে ঘিরে ফেলেছিল। সে এক সাংঘাতিক কান্ড। পুলিস ট্রলারের পেছনে তালা-বন্ধ দরজা গুলি করে ভেঙে ফেলেছিল। আর ট্রলারের ভেতর থেকেও গুলি ছুটে এসেছিল। আসলে ট্রলারের মধ্যেই সেই ব্যাংক-ডাকাতির ডাকাতরা ছিল, টাকার

পিটলের কেসগুলো ভেতরে বসে ভাঙছিল। শেষ পর্যন্ত ডাকাতরা ধরা পড়েছিল, টাকাও সব পাওয়া গিয়েছিল। গোগোলকে নিয়ে সকলের কী আনন্দ!

এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা গোগোলের এই দশ বছরের জীবনেই ঘটে গিয়েছে। আসলে ওর সবকিছুতেই কৌতূহলটা একটু বেশি, নজরটাও রীতিমতো ধারালো। কিন্তু ওর ঘটে বুদ্ধি একটু কম। কারণ, ঘটনা না জেনেই, ও সবকিছুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। আর তার ফলে অনেকবার বিপদ ঘটতে-ঘটতে বেঁচে গিয়েছে। যেমন, পুরীর সমুদ্রের ধারে এক খালি বাড়িতে. ওর কানের পাশ দিয়ে রিভলবারের গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই পোড়ো বাড়িটাতে একজন ভাল পোশাক পরা লোককে ঢুকতে দেখে ওর কেমন মনে হয়েছিল, লোকটা যেন চুপিচাপি লুকিয়ে ঢুকছে। তাতে ওর কী যায় আসে? সেকথা কে বলে। ও ঠিক সেই পোড়ো বাড়িতেই ঢুকেছিল, আর একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে খাটের ওপর একজন মহিলা ঘুমিয়ে ছিলেন। আর যে ভদ্রলোককে ও ঢুকতে দেখেছিল, তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন খাটের পাশে। গোগোলের মনে কেমন একটা খটকা লেগেছিল। সে-কথাও ও ওর বাবা মাকে বলেছিল। বাবা ধমক দিয়ে, ওকে সেই পোড়ো বাড়িতে যেতে বারণ করেছিলেন।

গোগোলের মাথায় যে পোকা! বাবা মা দুপুরে খেয়ে একটু চোখ বুজতেই ও সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির। বাড়িটার উঠোনটা কোমরসমান বালিতে ভর্তি। তার মধ্যে ও দেখল একটা সোনালী পাড় বালিতে উঁকি দিচ্ছে। সেটা তুলতে গিয়ে, ও বালি সরিয়ে আর কূল পায় না। তখন হঠাৎ অন্য এক ভদ্রলোক এসে হাজির। বললেন, "এসো, দুজনেই বালি খুঁড়ি। তোমাকে দিয়েই বোধহয় আমার কাজ হবে।" এই কথা বলতে বলতেই তিনি গোগোলকে জোর করে বালিতে শুইয়ে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়েছিলেন। তখনই কানের পাশ দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গিয়েছিল। পরে বালি খুঁড়ে একজন মৃত মহিলাকে পাওয়া গিয়েছিল। আর ভদ্রলোক মহা আনন্দে গোগোলকে মাথায় করে নাচতে লাগলেন। তারপরে গোটা পুরী শহরের আর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসা লোকজনরা ওকে দেখবার জন্য হুড়োহুড়ি করেছিল।

এরকম ঘটনার মধ্যে ছেলে জড়িয়ে পড়লে, সব বাবা-মায়ের মনেই অশান্তি হয়। তার মানে এই নয় যে, গোগোল দিনরাত্রি এসব ভাবে। লেখাপড়ার পরে, পাড়ার আর অন্যান্য ফ্ল্যাটের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পেলে, ও আর কিছু চায় না। আবার খেলতে-খেলতেই, হয়তো কোনো লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর নানান কথা মনে হতে থাকে। তার কারণ আর কিছু না, লোকটার মুখের চেহারায় ও যেন নতুন-কিছু দেখতে পায়। খেলতে-খেলতে এরকম থেমে গেলে, বন্ধুরা রেগে যাবেই। ও তখন বন্ধুদের বলে, অমুক লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল, লোকটা মনে-মনে কাঁদছে। কখনো বলে, অমুক লোকটা খুব হাসছিল, কিন্তু ওর মনে হল, লোকটা ভেতরে-ভেতরে রেগে আছে। বন্ধুরা এসব কথা মোটেই শুনতে চায় না, একমাত্র জর্জ ছাড়া। জর্জ ওরই বয়সী, পাড়ার অ্যাংলো ইনডিয়ানদের বাড়ির ছেলে। নিজেদের মস্ত ফ্ল্যাটবাড়ি ছাড়া, পাড়ায় দু তিনটি বাড়িতে যাবার অনুমতি ওর আছে। অনুমতি ওর মা দিয়েছেন। মা পাড়ার ব্যাপারে যত জানেন, বাবা তত খবর রাখেন না। বাবার অফিস আছে, লাইব্রেরিতে পড়াশোনা আছে, ক্লাবে খেলতে

ঝন্টু-মন্টুর গল্প (৮)

চিত্র—পরাগ রায়
বয়স—১১ বছর

এ শহরটা ঝন্টু-মন্টুদের মত তোমারও। এই শহরের ভালো মানে তোমারও ভালো — ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

"সুতানুটি গেজেট" এবং "ক্যালকাটা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার" প্রতিখানির দাম ১ টাকা, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস কলকাতা-১৭ তে পাওয়া যাচ্ছে।

যাওয়া আছে। শনিবার আর রবিবারের সকালে, ও বাবার সঙ্গে লেক ক্লাবে সাঁতার শিখতে যায়।

গোগোলের নিজেরও এখন একটা অশান্তি হয়েছে। ওর দাঁত পড়তে আরম্ভ করেছে, নতুন কয়েকটা উঠেছে। ফলে ওর হাসিটা গিয়েছে বদলিয়ে। অনেক কথা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফস্‌কে বেরিয়ে যায়। ওর ছোটখাটো চেহারাটা হঠাৎ খানিকটা লম্বা হতে শুরু করেছে, তাই ওকে রোগা দেখায়। মাথার চুল ভুরুর এক ইঞ্চি ওপর থেকে ছাঁটা। ওর মনে-মনে খুব শখ, বড় ছেলেদের মতো বড় চুল রাখে। তার উপায় নেই। বাবা-মা তো পছন্দ করেনই না। ইস্কুলে একদম বারণ। ভুরুতে চুল ছুঁলেই, আন্টি কাঁচি দিয়ে কেটে দেবেন। ওর কখনো সে-হাল হয়নি। কোনো-কোনো ছেলের হয়েছে।

গোগোলের চেহারাটা ওর মায়ের মতো। ফরসা, টিকলো নাক, কালো বড়-বড় চোখ। আজকাল ও মাঝে-মাঝে বেলবটস পরে বাবা-মায়ের সঙ্গে উৎসবে বা সিনেমা দেখতে যায়। আর ইস্কুলে যাবার সময় বা খেলতে যাবার সময়, মা ওকে একটা কথা রোজই বলে দেন, "কোনো আজেবাজে ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে যাবে না।"

গোগোল লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘাড় কাত্‌ করে সায় দেয়। ও মাকে বেশি ভয় পায়। বাবার সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব।

গোগোলের ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ইস্কুলের ইউনিফর্ম ছাড়তে যেটুকু সময়। মাকে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়, ওকে খাওয়াতে। কিন্তু ওর যে খেলার সময় চলে যায়। সাড়ে ছ'টা বাজলেই তো অনীতাদি পড়াতে আসবেন।

গোগোল আজ বাড়ি ফিরে এসে দেখল, মায়ের মুখ কেমন শুকনো। চোখে একটা ভয়-ভয় ভাব। ও ছটফট করে ইস্কুলের ইউনিফর্ম ছাড়তে-ছাড়তে মায়ের দিকে দেখল। মা আজ ওকে খাওয়াবার জন্য মোটেই খুব উঠে-পড়ে লাগলেন না, বরং খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "বাড়ির ঘেরা লন ছাড়া, আর কোথাও খেলতে যাবে না। রাস্তায় একদম নয়। বন্ধুদের কারোর বাড়ি যাওয়াও চলবে না।"

গোগোল ওয়ারড্রোবের খোলা পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে, অন্য প্যান্ট পরতে পরতে জিজ্ঞেস করল, "কেন মা?"

মা বললেন, "খাবার ঘরে এসো, বলছি।"

গোগোলের মনে ভীষণ কৌতূহল হল। জামা পরতে-পরতে ভাবল, কী হতে পারে? পাড়ায় কি ছেলেধরা এসেছিল? কোনো ছেলেকে বস্তায় পুরে নিয়ে চলে গিয়েছে? খাবার ঘরে এসে দেখল, মা ওর দুধের গেলাসে চামচ ঘাঁটছেন। ও একেবারে মায়ের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে মা?"

মা বললেন, "সাততলার ডাবু—তোমাদের ডাবুদা—গতকাল ইস্কুলে গেছলো, আজও ফিরে আসেনি। ডাবুর কোন খোঁজ-খবরও পাওয়া যায়নি। পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিস বাড়িতেও এসেছিল। ডাবুর মা আর দিদি খুব কাঁদছেন। আর ডাবুর বাবা পাগলের মতো গাড়ি নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

গোগোল ভীষণ অবাক হয়ে গেল। ডাবুদা ক্লাস এইটে পড়ে। চোদ্দ বছর বয়স। একলা হেঁটে-হেঁটে ইস্কুলে যায়। এত বড় ছেলেকে কি ছেলেধরা চুরি করে নিয়ে যেতে পারে? গোগোল সে-কথাই মাকে জিজ্ঞেস করল, "ডাবুদাকে কি ছেলেধরা নিয়ে গেছে?"

মা বললেন, "কেউই কিছু বলতে পারছে না। শুনলাম, পুলিস হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আমি তো কাল কিছুই শুনিনি। আজ তুই ইস্কুলে চলে যাবার পরে সব শুনলাম। আমি সাততলায় ডাবুদের ফ্ল্যাটে গেছলাম।"

গোগোলের খাওয়া মাথায় উঠে গেল। জিজ্ঞেস করল, "ডাবুদার মা কী বললেন?"

মা বললেন, "কী আবার বলবেন, খালি কাঁদছেন। তুমি খাবারটা খেয়ে নাও।"

গোগোল একটা মাখন লাগানো স্যাঁকা রুটি তুলে কামড় দিল, আর চিবোতে-চিবোতেই বলল, "পুলিস কী বলেছে?"

মা বললেন, "পুলিস এখনো কিছুই বলতে পারছে না। শোন গোগোল, দিনকাল খুব খারাপ। ডাবুর কপালে যে কী ঘটেছে, কেউ বলতে পারছে না। এই তো সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, একটি চোদ্দ বছরের ছেলেকে কারা যেন মেরে ফেলে জলার ধারে ফেলে দিয়ে গেছে। আর সেই গুজরাটি ছেলেটি নাকি লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল।"

গোগোল মনে মনে ভাবল, ডাবুদা কখনোই লেখাপড়ায় ভালো ছেলে নয়। এ-কথা এই আট-তলা বাড়ির আর পাড়ার সবাই জানে। ডাবুদারা বেশ বড়লোক। আর ডাবুদা নাকি লুকিয়ে সিনেমা দেখতে যায়। এমন কি সিগারেটও নাকি খেতে দেখা গিয়েছে। গোগোল এসব কথা বাড়িতে বলে না। এসব কথা ও ওর বন্ধুদের কাছে শুনেছে। কিন্তু ডাবুদা এমনিতে ছোটদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। ডাবুদাকেও কি তবে সেই গুজরাটি ছেলেটার মতো মেরে ফেলেছে কেউ? গোগোলের গলায় মাখন রুটি আটকিয়ে গেল। যেন ওর বুকের ভেতর থেকে একটা

আচমকা ভয় গলার কাছে ঠেলে উঠল, আর খক্‌খক্‌ করে কাশতে লাগল।

মা ওর মাথায় হাত দিয়ে আস্তে চাপড়ে দিলেন। বিরক্ত স্বরে বললেন, "বসো না, বসে খেতে পারছ না? বসে খেলে তোমার খেলার সময় কিছু কমে যাবে না। এই নাও, দুধের গেলাসে একটু চুমুক দাও।" মা দুধের গেলাসটা গোগোলের মুখের কাছে তুলে ধরলেন।

গোগোল দুধের গেলাসে চুমুক দিল। পাশের চেয়ারে বসল। মনের কথাটা চেপে রাখতে পারল না, বলেই ফেলল, "আমি খেলার কথা ভাবছি না।"

মা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "তবে ভাবছিসটা কী?"

গোগোল বলল, "আমি ডাবুদার কথা ভাবছি। আচ্ছা মা, সেই গুজরাটি ছেলেটার মতো ডাবুদাকে কি কেউ মেরে ফেলতে পারে?"

মা যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠে বললেন, "ছি ছি, ওসব কথা ভাবতে নেই। ডাবুকে কেন কেউ মেরে ফেলবে?"

গোগোল রুটি চিবোতে চিবোতে বলল, "গুজরাটি ছেলেটাকে তাহলে কেন মেরেছে?"

মা একটু যেন রেগে গিয়েই বললেন, "গুজরাটি ছেলেটাকে নাকি ওর চেনাজানা লোকরাই মেরেছে। ডাবুর সেরকম কোনো ব্যাপারই নেই, থাকতেও পারে না। কিন্তু দ্যাখ্‌ গোগোল—" মা এবার একটু ঝেঁঝেই বললেন, "তুই ওসব আজেবাজে কথা একদম ভাববি না। গুজরাটি ছেলেটার ব্যাপার তুই বুঝবি না, ওসব বিচ্ছিরি সব ভজকটো ব্যাপার। আর ডাবুদার কথাও তোকে ওরকম করে ভাবতে হবে না। তোর মতো ছেলের এসব নিয়ে ভাবাভাবি আমি একটুও ভালবাসি না। তুই তোর ভাবনা নিয়ে থাক। তোকে যা বলে দিলাম, তা মনে করে রাখিস। বাড়ির বাইরে, বন্ধুদের বাড়ি-টাড়ি এখন যাওয়া চলবে না।" তারপরে মা খানিকটা আপন মনেই বলতে লাগলেন, "দেশটার যে কী হয়েছে। রোজই ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নানান-রকম খারাপ খবর বেরোচ্ছে।"

গোগোলেরই হল মুশকিল। এক পিস রুটি কোনোরকমে যদিও খেতে পারল আর-একটা কিছুতেই চিবোতে পারছে না। ওর মনের মধ্যে যে এখন কী রকম তোলপাড় করছে, মাকে তা বোঝানো যাবে না। বোঝাতে গেলেও মা রেগে যাবেন। গোগোল যে এখন অনেক কিছুই বুঝতে পারে, মা তাও জানেন না। এখন ও প্রেপ-থ্রিতে পড়ে। গত বছরেও বাংলাটা একটু কম জানত। এখন বাংলা খবরের কাগজ গড়গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। গুজরাটি ছেলেটাকে যে তার চেনাজানা লোকরাই মেরে ফেলেছে, সেটা ও শুধু খবরের কাগজেই পড়েনি। ইস্কুলের আর পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গেও তা নিয়ে ওর কথা হয়েছে। গুজরাটি ছেলেটিও খুব বড়লোকের ছেলে ছিল। ডাবুদাও বড়লোকের ছেলে। অবিশ্যি ডাবুদাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা গোগোল কিছুই জানে না।

এই সময় নীচে দু-তিনটে গাড়ির হর্ন এক সঙ্গে বেজে উঠল, আর আওয়াজ শুনে মনে হল, এ বাড়িরই চত্বরে ঢুকল। মা তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে নীচের দিকে দেখলেন। গোগোল দেখল, এই একমাত্র সুযোগ, আর-এক পিস মাখন-রুটি ও চট্‌ করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। এটুকু ফাঁকি না দিয়ে কোনো উপায় নেই। ও যে কিছুতেই এখন আর খেতে পারবে না, মা তা বুঝবেন না, ছাড়বেনও না। কিন্তু দুধের গেলাসে চোঁ চোঁ করে চুমুক দিয়ে, প্রায় ওষুধ খাওয়ার মতোই খেয়ে নিল। হাতের পেছন দিয়ে ঠোঁট মুছে ছুটে গেল মায়ের কাছে। এখন ও অনায়াসেই উঁচু জানালায় মুখ বাড়িয়ে নীচেটা দেখতে পায়। গত বছরও পেত না।

গোগোল নীচে, ওয়ারলেস লাগানো লাল রঙের জীপটা দেখেই চিনতে পারল, ওটা পুলিসের গাড়ি। তার পাশেই দাঁড় করানো রয়েছে ডাবুদাদের নীল রঙের গাড়ি। আরও একটা কালো গাড়িও তার পাশে। আর সেগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরই বন্ধুরা, সুমিত, টুকাই, পাঞ্জাবি বন্ধু গোগে, জর্জ আর পারভেজ। ওরা মাঝে মাঝে ওপর দিকে দেখছে, কিন্তু গোগোলদের জানালার দিকে একবারও দেখছে না। বাঁ দিকে, ডাবুদাদের সাততলার ওপরেই সকলের নজর।

গোগোলের মনে আশা হল, ডাবুদাকে বোধহয় খুঁজে নিয়ে আসা হয়েছে। মাকে ও সে-কথাই জিজ্ঞেস করল, "ডাবুদাকে নিয়ে এল?"

মা মাথা নেড়ে, একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "না। নীহারবাবু, পুলিশ অফিসার, আরও সব কারা যেন এলেন।"

নীহারবাবু মানে নীহাররঞ্জন দত্ত, ডাবুদার বাবার নাম। কিন্তু গোগোলের পক্ষে আর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। নীচে যাবার জন্য ওর ভেতরটা ছটফটিয়ে উঠল। ও বলল, "মা, আমি তাহলে এখন নীচে যাচ্ছি।"

মা আগেই টেবিলের দিকে তাকালেন। খাবারের প্লেট খালি দেখে গোগোলের মুখের দিকে তাকালেন। গোগোল তাড়াতাড়ি মায়ের দিক থেকে ফিরে, বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মায়ের এই চাহনিকে ওর খুব ভয়। ওর না-খাওয়ার ফাঁকিটা হয়তো এখনই ধরে ফেলবেন। বাইরে যাবার দরজা খোলবার আগেই, পেছন থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, "যা বলেছি তা মনে থাকে যেন। বাড়ির সীমানার বাইরে কোথাও যাবে না। আমি যেন জানালা দিয়ে উঁকি দিলেই তোমাকে দেখতে পাই।"

গোগোল ঘাড় কাত করে বলল, "আচ্ছা।" তারপরে দরজা খুলে বেরিয়ে আগেই ছুটে গেল এলিভেটর—মানে লিফটের সামনে। আলোর সংকেত দেখল, লিফট সাততলায় রয়েছে। গোগোল হঠাৎ ঠিক করতে পারল না, সাততলায় ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে যাবে, না নীচের বন্ধুদের কাছে আগে যাবে। (ক্রমশ)

ছবি/সমীর সরকার

অন্যায়

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মালেতে বোঝাই যত নাদাপেটা নৌকো,
আগাগোড়া চাঁচা-ছোলা লম্বাটে চৌকো,
দেখা মেলে নদী খালে,—পাল নেই, দাঁড়ও নেই,
ঢিলে-ঢালা, নিজে থেকে চলবার চাড়ও নেই;
স্টীমারেতে বেঁধে দিলে তারই টানে চলে যায়;
অপমান করে লোকে 'গাধাবোট' বলে তায়।
এঞ্জিনে-টানা গাড়ি চলে রেল-লাইনে
ঢের বেশী মাল বয়ে, তারে কোন্‌ আইনে
'মালগাড়ি' বলি মোরা 'গাধা-গাড়ি' না-বলে?
মানুষের এটা ভারী অন্যায় তা বলে।

মেরু-রহস্য

বড় পুরুতমশাইয়ের আদেশে প্রহরীরা ছুটল তাদের বজরার দিকে...

জাহাজঘাটা থেকে দূরে ফ্রেইজা তাদের নিয়ে চলল এক পাথুরে বাঁকের দিকে...

তাদের নিয়ে উঠল লুকোনো এক ছোট নৌকোয়...
অসংখ্য ধন্যবাদ !
তাড়াতাড়ি উঠুন !

শিকারীদের একটা গুহা আছে ওদিকে... শুকনো কাপড়চোপড় আর খাবার আছে ওখানে...চট্‌পট্‌ সেখানে পৌঁছতে হবে !

নদীর বাঁকে... হঠাৎ ...
ওই ওরা আসছে !

যে করেই হোক, তীরে পৌঁছতেই হবে !
12-22

আমার পিছন-পিছন আসুন ! গুহাটা খুব দূরে নয় !

কিছুক্ষণ চলবার পর...
আর ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না !
পাতা ওলটাও

দমবন্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটে তাদের... নদীর জলে ভাইকিংদের পালতোলা বজরাটি এগোতে থাকে...
-আমাদের খোঁজ পায়নি!

শীগ্‌গিরই সেই গুহায় পৌঁছতে হবে!

পরদিন ভোরবেলা গরম পোশাক গায়ে দিয়ে শিকারীদের গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল ওই পলাতকের দল...
বড়-পুরুত আমাদের ছাড়বেন না। এক-মাত্র উপায় 'তিমি-উপসাগর' দিয়ে যদি বেরুনো যায়!
তিমি-উপসাগর?

হ্যাঁ, ওরা খুব পবিত্র বলে মানে। ভাইকিংরা সেখানে ঘেঁষবে না!
অশুভ আত্মা!

আস্ত্রাগার্দের ন্যাড়া এবড়োখেবড়ো আগ্নেয়গিরি-ঘেরা জমির উপর দিয়ে চলতে থাকে তারা...
ভাবা যায় না!
কী ভয়ংকর জায়গা!

আগ্নেয়গিরি-অঞ্চল পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছয় তুষার-ঢাকা এক উপত্যকায়...তার মাঝখানে এক গহ্বর...
কিংবদন্তী শুনেছি ওই সুড়ঙ্গ পথেই প্রথম ভাইকিংয়েরা এই সবুজ উপত্যকায় উঠে এসেছিল।
12-29

তক্ষুনি উমিয়াক হেঁকে ওঠে, 'সাবধান'!
ওই যে বড়-পুরুত আর তাঁর প্রহরীরা!

প্রোফেসর আইভারসনও অমনি সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ওই গহ্বরে...
আদি ভাইকিংয়েরা যদি সমুদ্রপথে এসে তারপর এখান দিয়ে উঠে এসে থাকে, তাহলে ওই একই পথে আমরাও সমুদ্রের দিকে যেতে পারব!
এর পর আগামী সংখ্যায়

কী নিয়ে গোলমাল

কুম্ভক

কাকু, আমার ইস্কুলের বন্ধুরা তোমাকে খুব বকেছে।

আমাকে? কেন?

কেন বকবে না? অর্চিতা বলেছে, তুমি নিজেই একটা শব্দ এক-একবার এক-একরকম লেখো, আবার অন্যের দোষ দাও।

সত্যি না কি? কী শব্দ?

টুম্পি একটু চুপ থেকে বলল ঃ আচ্ছা, এই-যে তুমি আমাকে দুটো প্রশ্ন করলে, এটা একটু লিখে দেবে?

লিখে দেব? কেন? বন্ধুদের দেখাবি?

না না। বন্ধুদের কেন দেখাব। নিজেই দেখব। দাও-না একটু লিখে।

নন্তু বলল ঃ এইবার কাকুর পরীক্ষা নেবে টুম্পি।

অগত্যা লিখতে হল একটা স্লেট টেনে নিয়ে, বড় বড় করে ঃ সত্যি না কি? কী শব্দ?

এই তো ধরা পড়ে গেছ। এই দেখো, একই শব্দ তুমি দুই বানানে লেখোনি? একেবারে পাশাপাশি? এই দেখো, একবার 'কি', একবার 'কী'।

আচ্ছা! এই ব্যাপার? তোর বন্ধুরা তো ভালই বলতে হবে। তো, কাকুকে বকে দিল, আর তুই কিছু বললি না?

নন্তু বলল ঃ কাকুর মতো তুইও একটা নিয়ম বানিয়ে দিলে পারতিস।

একটু লাজুক মুখে টুম্পি বলল ঃ আমি যে কিছু বলিনি, তা অবিশ্যি নয়। বলে দিয়েছি যে ওটা একরকম 'কি' নয়, দুরকম 'কি'।

ওই দেখো, কাকুর ভূত।

বলে দিয়েছি যে একটু হালকা করে বললে হবে 'কি', আর, একটু জোর দিয়ে বললে হবে 'কী'।

শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ল নন্তু। বলতে লাগল ঃ মেয়েরা বললে 'কি', ছেলেরা বললে 'কী'। রোগারা বললে 'কি', মোটারা বললে 'কী'।

এত হাসির কিছু হয়নি নন্তু। তবু তো বুদ্ধি করে বলেছে একটা-কিছু। আর টুম্পির কথাটার একেবারে-যে কোনো মানে নেই, তাও নয়। আসলে, সত্যিই একটা প্রভেদ করা যায় ওই দুটোর মধ্যে। সকলে যে এই প্রভেদটা মেনে লেখেন, তা অবশ্য নয়। কিন্তু মেনে চললে কথার মানে বুঝতে একটু সাহায্য হয়।

কী রকম?

আবার আমি স্লেট টেনে নিই। নিয়ে তার দুপিঠেই লিখি 'তুই কি খাবি?' টুম্পি আর নন্তুর হাতে দিয়ে বলি ঃ এক-একজন এক-এক পিঠে এর উত্তর লেখো। কেউ কারোটা দেখবে না।

লেখা হল উত্তর। টেনে নিয়ে দেখি ওদের দেখাই, টুম্পি লিখেছে 'খাব' আর নন্তু লিখেছে 'আম'।

দেখছিস মজা? একই প্রশ্ন দুজনের কাছে দুই মানে নিয়ে গেছে। টুম্পির কাছে প্রশ্নটা ছিল, কিছু খাবে কিনা। টুম্পি বলল, খাব। নন্তুর কাছে প্রশ্নটা হল, কোন্ জিনিস খাবে। নন্তু বলছে, আম; আম খাবে। লিখে প্রশ্ন করেছি বলেই এই গোলমালটা হল। মুখে প্রশ্ন করলে, কোন্ শব্দের ওপর ঝোঁক দিচ্ছি, সেইটে লক্ষ করেই ঠিক উত্তরটা এসে যেত। হয় শেষ শব্দে ঝোঁক দিয়ে বলতাম 'তুই কি **খাবি**' আর নয় তো 'কি'-এর ওপর চাপ দিয়ে বলতাম 'তুই **কি** খাবি'। তিনটে একই শব্দ, কিন্তু মানে কেমন পালটে গেল।

ভারি মজা তো!

ঠিক, মজা। কিন্তু লেখায় এ-রকম মজা হতে থাকলে একটু অসুবিধা না? তাই দু জায়গায় দুটো বানান করে নেন অনেকে। তখন লিখতে পারি 'তুই কি খাবি' আর 'তুই কী খাবি'; দুটো আলাদা কী—মানে আলাদা চাবি—হয়ে গেল!

নন্তু জিজ্ঞেস করল ঃ তাহলে জোরের কথাটাই আসল? টুম্পি তাহলে ঠিকই বলেছে?

পুরোপুরি ঠিক নয়। জোর বললেই সব সময়ে বোঝানো যায় না। আসল কথা হল, একটা 'কি' নিতান্তই প্রশ্নবাচক, নিতান্তই জিজ্ঞাসার চিহ্ন। 'তুমি যাবে?'—কথাটাকে এভাবেও বলা যায়, 'তুমি কি যাবে?' তেমনি 'তুই কি খাবি?' কথাটাতে বলা যেত 'তুই খাবি?' এই কি-টা হলো হ্রস্ব ই-কার।

আর দীর্ঘ?

বাকি সব জায়গায় দীর্ঘ করে দে। সর্বনামে, বিশেষণে, ক্রিয়াবিশেষণে। কী করবে? কী খাবে? কী শব্দ! কী মজা! কী করে যাবে?—এই নন্তু, কী লিখছিস তুই স্লেটে?

নন্তু বলল ঃ লিখতে যাচ্ছিলাম 'তাই কি?' কিন্তু কী বানান হবে ভেবে আর লিখলাম না।

তোর জিজ্ঞাসা যদি হয় Is it so, তাহলে লেখ 'তাই কি'। আর যদি বলিস, যা তুই হামেশাই বলিস, So what—তাহলে লিখবি 'তাই কী'! এর মধ্যে আর শক্তটা কী?

ব্ল্যাকি

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

ছু মন্তর ছু। ছোট্‌কাটা একটা আস্ত জাদুকর। কথাটা নতুন শিখেছে বিল্টু। জাদুকর বলতেই চোখে ভাসে সেই সাদা-দাড়ি আলখাল্লা পরা লোকটা। ছোট্‌কার অবশ্য সাদা দাড়ি নেই। তাহলেও ওর কালো চশমার ফাঁকে চোখটা ঠিক সেই ছবির জাদুকরের মতো। সে তো যখন তখন তার ঝুলি থেকে যা ইচ্ছে তাই বার করতে পারে। আজ যেমন করল। বিল্টু প্রথমটায় বুঝতে পারেনি।

গল্পের গোড়াটা না বললে কোনোই মজা নেই। বাবা বলে দিয়েছেন, "রাস্তার আলো জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ফিরো বিল্টু।" সন্ধেবেলা বাড়ি না ঢুকলে দারুণ শাস্তি। মার নয়, বকুনি নয়, শুধু কেউ ওর সঙ্গে কথা বলবে না। এর চেয়ে ভীষণ শাস্তি আর কী হতে পারে। বাড়িসুদ্ধ লোক সবার সঙ্গে কথা বলছে, ছোটভাই মিল্টুও জানলায় বসে 'ছড়াছবিতে জানোয়ার' বইয়ের ছড়া পড়ছে, মা পড়া ধরছে, বাবা কোর্ট থেকে ফিরে মক্কেলদের সঙ্গে গল্প করছেন, হিরুদা চা দিয়ে আসছে। অথচ কেউ "পড়তে বসো" এই কথাটাও বিল্টুর সঙ্গে বলছে না। ভাবা যায়?

তাই দু-দুবার এরকম হবার পরে বিল্টু আর কখনো রাস্তায় সন্ধের আলো জ্বলে গেলে বাড়ির বাইরে থাকে না। চম্পক, জগাই, নিতু, সব্বাই এখনও মন্টুদের বাড়ির পাশের কাঁঠালগাছ-তলার সিঁড়িতে বসে গল্প করছে। একটু কেন, বেশ অন্ধকার হয়েছে। আর বল দেখা যায় না। তাই খেলা বন্ধ করে ওরা একটু ওখানে বসে। বন্ধুরা ওকে খ্যাপায়, "যাও যাও, ভাল ছেলে বাড়ি গিয়ে দুদুভাতু খাও।" তবুও বিল্টু বাড়ি চলে আসে। রাস্তার আলো জ্বলে গেছে যে...

আজ বাড়ি ফিরে নীচের খাবার ঘরে বসে জলখাবার খেয়ে সবে ওপরে এসে পড়তে বসবে বসবে করছে, এমন সময় ছোট্‌কা এসে চেঁচাল, "ছু মন্তর ছু, লাগ্‌ ভেল্‌কি লাগ্‌।" বিল্টু তার ছোট্‌কাকে খুব ভাল করে চেনে। তাই গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চোখ সরু করে আড় চোখে বলেছিল, "আজ কী এনেছ? ক্যাড্‌বেরি না বাদাম-বিস্কুট?"

"হুঁ হুঁ, এক জোড়া দারুণ জুতো। এক্সপোর্ট হচ্ছে।"

ঠিক সেই রকম রহস্যময় জাদুকরের ভঙ্গিতে ছোট্‌কা হাতের বাক্সটা ঘরের কোণে সাবধানে নামিয়ে রাখল।

"ডাক শিগ্‌গির মিল্টুকে ডাক। হুঁ হুঁ বাবা, এ জ্যান্ত জুতো। পায়ে দিলে ঘরময় দৌড়ুবে, ক্যাঁও-ম্যাঁও করবে। কিন্তু সাবধান, তোর দিদুর ঠাকুরঘরে যদি এ জুতো বেড়াতে যায় তবে তিনি তোমাকে বাড়িছাড়া করবেন। জুতো তো যাবেই, আমাকেও বিলেতের পাসপোর্ট করাতে হবে।"

ছোট্‌কাটা এত সুন্দর হাতমুখ নেড়ে জুলফি ঝাঁকিয়ে কথা বলে না! সুমন, নিতু, জগাই কারও এমন কাকা নেই। এদিকে বাক্সের মধ্যে কী আছে জানবার জন্যে পেট ফুলছে। জ্যান্ত জুতো কী রকম? এদিকে ছোট্‌কার চেঁচামেচিতে ঘরের মধ্যে সবাই হাজির। মিল্টু, মা, সব্বাই। মা এসেই বলল,

"ঠাকুরপো, দাঁড়াও তোমার দাদাকে ডাকি।" মায়ের মুখে কীরকম দুষ্টু হাসি মাখানো।

"ওরে ব্বাবা! আমি আমার কাজ সারি, দাদার কাজ দাদা। খবরদার।"

হরুদাও হাতে ফুলঝাড়ু নিয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসছে। আর ছোটকা এক পা ভাঁজ করে এক হাঁটু গেড়ে জুতোর বাক্সের পাশে বসে "ছু মন্তর" বলে জাদুর ভঙ্গিতে হাত ঘোরাচ্ছে।

ওমা সত্যি! হঠাৎ বাক্সটা খড়বড় করে নড়ে উঠল। মা-ও চমকে গেল। "ও ঠাকুরপো, এ যে সত্যিই নড়ছে।"

"নড়বেই তো। হুঁ হুঁ ব্বাবা, জ্যান্ত জুতো বলে কথা। লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্, ছু মন্তর ছু, হুস্" বলেই টান মেরে জুতোর বাক্সের ডালাটা খুলল ছোটকা।

ও মা। ভেতরে ওটা কী? বিল্টুর চোখ রসগোল্লা! মাও হতভম্ব। বাক্সের ভেতরে কালো পশমের বলের মতো কুচকুচে লোমওয়ালা একটা কুকুরের বাচ্চা। জুলজুলে লাল-লাল বটফলের মতো চোখে গুটিশুটি মেরে ঘরভর্তি অচেনা মানুষ দেখছে। ছোটকা বাক্স উলটে ওকে বের করে মেঝেতে ছেড়ে দিল। আর আনন্দে ছোটকাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় নাচতে লাগল বিল্টু।

সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে নটা। তিন ঘণ্টা সময় হাতের মুঠোর মধ্যে দিয়ে ফুস। কোথা দিয়ে সময় যায় রে। অন্যদিন এমন সময় পড়তে থাকলে একটার জায়গায় দুটো তিনটে অক্ষর দেখত বিল্টু। কান খাড়া করে থাকত কখন মা নীচে থেকে খেতে ডাকে। ঘুমে-ঢুলে-পড়া জল-এসে-যাওয়া চোখে আলোর বাল্‌বের দিকে তাকালে ওর চারপাশে গোল রামধনু দেখে বিল্টু।

আর এখন ঘরের কোণে কালোকুলো পশমের ড্যালার মতো সাঁত্যকারের একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরের বাচ্চা থুপথুপে থাবায় নাকমুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। সামনে একটা কলাইকরা বাটিতে গুঁড়ো গুঁড়ো পাউরুটি দুধমাখা লেগে আছে। তার পাশে সেই ডালাখোলা কাত হওয়া জুতোর বাক্স। ঐটুকু বাচ্চা, কিন্তু পেটুক খুব। কাঁউ কাঁউ করে সবটুকু খেয়ে নিল। এখন ঘুমোচ্ছে। বিল্টু উবু হয়ে ওর পাশে বসে গুটিশুটি ঘুমোনো তুলতুলে বাচ্চাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

এদিকে মা নীচে থেকে ডেকে ডেকে সারা, রাত্তিরের খাবার দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা! একদিন রাত্তিরে না খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? যত্তসব। মা বলে, "রাত উপোসি হাতিও শুকিয়ে যায়।"

সেদিন রাত্তিরে শুয়ে ভাল করে ঘুমই হল না বিল্টুর। ভাগ্য ভাল, এখন পরীক্ষার চাপ নেই। বাবা বাড়িতে জন্তু-জানোয়ার পোষা পছন্দ করেন। তবুও গম্ভীর মুখে খাওয়ার টেবিলে বিল্টুকে বললেন, "দেখো! পড়াশোনা ছেড়ে সারাদিন কুকুর-কুকুর করলে আমি কিন্তু অনিলের বাড়িতে ওই কুকুর দিয়ে আসব।"

বিল্টু একদম চুপ করে ছিল। যাকে বলে, "স্পিকটি নট"। এদিকে তো ছোটকাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়ে গেছে। ব্ল্যাকিকে ও এমন ট্রেনিং দেবে যে, পুলিশের কুকুর লাকি-মিতারও চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। ঐ যাঃ, বাচ্চাটার নাম যে রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ব্ল্যাকি দেওয়া হয়েছে, সেটাই বলা হয়নি।

ওদিকে তেতলার কোণের ঘর থেকে দিদু গজ্-গজ্ করছে, "বাউনের বাড়ি। পুষবি তো পোষ পাখি পোষ, দুবেলা হরিনাম করবে, প্রাণটা জুড়িয়ে যাবে। তা নয়তো কোত্থেকে এক কেলে কুকুরের বাচ্চা! আমার নিরিমিষ্যি ঘরের চৌকাঠ পেরুলে ঠ্যাঙা মেরে খোঁড়া করে বিদেয় করব।"

আর ব্ল্যাকিটা এমনই বোকা, সেই দিদুর রাগের সময় কোথায় চুপ করে থাকবি, তা না খৌ খৌ করে ডেকে নিজের ঘর থেকে নেমে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো দিদুর লুটোনো সাদা আঁচল ধরে এক টান।

যাবে কোথায়, দিদু তো কাঁই মাঁই করে চেঁচিয়ে একাকার। ভ্যাগিস হিরুদাটা ম্যানেজ করে দিল। তা নইলেই হয়েছিল আর কি! ভাবলেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

শুয়ে শুয়ে ঘুমই আসছিল না বিল্টুর। এদিকে কারুরই কোনো চিন্তা নেই কী করে কুকুর মানুষ হবে। দিদু তো বলল, পাখি পোষো, হরিনাম করবে। কেন, বাড়িতে কি পাখি নেই? আহা, কী পাখি রে। সাদা কাকাতুয়া "অরণি"টা সারাদিন দাঁড়ে বসে ঢোলে। কাবলি মটর, পাকা কলা খেয়েও ওর পেট ভরে না। কাউকে চা খেতে দেখলেই ক্যাঁ, ক্যাঁ করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে দাঁড়ে দুলে পাখা ঝাপটে বলবে "অরণি-ই, অরণি-ই, দাও।" মানে, দাও আমার দাঁড়ের বাটিতে একটু চা ঢেলে। এত নেশাখোর! চা একটু না খেয়ে থামবে না। সব ওই দিদুর ট্রেনিং। হরিনামের ধার-কাছ দিয়েও যায় না ওই পাখি। খালি সারাদিন কী খাই কী খাই, আর দিদুর ঠাকুরঘরের বারান্দায় ঝোলে বলে দিদুর কথাই শিখেছে সব। "কে কেরে, এই এঁটো করল, ছুঁসনি ছুঁসনি, বাসি কাপড়, যা সরে যা"—এইসব। আর কড়া নাড়ার খট্ খট্ আওয়াজও মুখ দিয়ে করে। এই তো পাখি, তার আবার দেমাক কত! গা হাত পায়ে সব সময় ঠোঁটের চিরুনি চালাচ্ছে। মাথার ঝুঁটি ফুলিয়ে ফুলবাবুটি। হুঃ।

আর একজন? সে বাবার আদরের। তার তোয়াজ দেখে কে। উঠানের ঠিক মাঝখানে পোঁতা আড়াই তলা উঁচু গোল শাল কাঠের খুঁটি। মাথায় দরজা-জানালা বসানো সুন্দর কাঠের বাক্সের ঘর। সবুজ রঙ করা। আবার একটা বারান্দাও আছে। সে ওখানে বসে জুল জুল করে সারা বাড়ি নজর রাখে। গলায় বকলসের সঙ্গে আটকানো লম্বা চেন। চেনের পেছনটা খুঁটির সঙ্গে ঢিলে করে বাঁধা। আর কে? বাবার আদরের বাঁদর গালু। ওর দেশ নাকি মালয়।

গালু চেন সমেত তরতর করে খুঁটি বেয়ে ওঠানামা করে। ওই বাক্সের ঘরে থাকে। বাবা আর হিরুদা ওকে খাবার দেয় বলে ওরা ছাড়া আর কারুর কথা শোনে না। এমনকী মাকেও মুখ ভ্যাঙায়। এই তো বাড়ির জন্তু জানোয়ারদের ট্রেনিং। ওদের সঙ্গে মিশলে ব্ল্যাকিও দু দিনে বখে যাবে।

রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিল্টু স্বপ্ন দেখল, ব্ল্যাকি ভদ্রলোকের মতো গালুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে যেতেই গালু খ্যা খ্যা করে ওকে এক থাপ্পড় মেরে এক লাফে ওর বাক্সের ঘরে উঠে কিছুই জানে না এমন মুখ করে গালে হাত দিয়ে আকাশ দেখছে। আর তিনতলার বারান্দা থেকে অরণি পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে, "আ মোলো, সরে যা মুখপোড়া।" আর, হতভম্ব ব্ল্যাকি করুণ মুখে বিল্টুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াচ্ছে। ওদিকে, দোতলার বারান্দা থেকে গম্ভীর মুখে বাবা বলছেন, "বিল্টু, তোমার কুকুর, তুমি সামলাতে পার না। অভদ্রের মতো ও গালুকে বিরক্ত করতে যায়। আজই আমি ওকে অনিলের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।"

তারপর সারা রাত অন্ধকার বাড়িতে অনেক ঘরের আনাচে কানাচে যতই ও ব্ল্যাকিকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে ততই বোকা কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঠিক বাবার সামনে গিয়েই হাজির হচ্ছে। শুধু তাই নয়, চেয়ার থেকে নেমে আসা বাবার ফর্সা পায়ের পাতার ওপরই শোবার জায়গা করছে। আর রক্ষে নেই। বাবা হুঙ্কার ছেড়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। আর চমকে বিল্টু চেয়ে দেখল চারদিকে আবছা ভোর।

ছ মাস কেটে গেছে। এখন ব্ল্যাকি বেশ বড়সড়। গম্ভীরভাবে

ও এখন সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে। গন্ধ শুঁকে লুকোনো রুমাল খুঁজে বের করার খেলা দেখে ছোটকা কেন, বাবাও অবাক। এখন বিল্টুর পড়বার সময় ব্ল্যাকি টেবিলের নীচে নরম মখমলের মতো গা বিছিয়ে শুয়ে থাকে। তার কালো কার্পেটের মতো গায়ে আলতো আলতো পায়ের চাপ না দিলে বিল্টুর আমেজ হয় না। শুধু ছোটভাই মিল্টু ওকে হিংসে করে খুনসুটি করে। সবাই জানে, খাবার সময় কুকুর কেন, মানুষও বিরক্ত করলে রেগে যায়। আর মিল্টু ব্ল্যাকির খাবার সময়, খাবারের থালাটা বড় ঝুলঝাড়ার লাঠিটা দিয়ে ঠেলে দেয়। ব্ল্যাকি গোঁ গোঁ করে ভয় দেখায়। কামড়ায় না।

সকালে মাঠে শক্ত লাল রবারের বল দিয়ে ওকে খেলায় বিল্টু। খেলা দেখার জন্যে বাচ্চা ছেলেরা সার দিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে। কীভাবে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়ে বল ধরে ব্ল্যাকি। সাদা ঝকঝকে রোদ্দুর-পড়া দাঁতের ফাঁকে লাল বলটা কামড়ে যখন ব্ল্যাকি বিজয়গর্বে ফিরে আসে বা সবুজ ঘাসের ওপর লাফিয়ে ওঠা লাল বল তীক্ষ্ন চোখে দেখে এক লাফে কামড়ে ধরে তখন বিল্টুরই বুক দশ হাত হয়ে যায়। প্রায় নেকড়ে বাঘের মতো বিশাল কালো কুকুরটার মালিক হিসেবে সবাই ওর দিকে কেমন যেন ঈর্ষার চোখে তাকিয়ে থাকে।

এমনকী বয়স্ক লোকরাও, যারা ছোট-ছোট লোমওলা কুকুর নিয়ে পার্কে বেড়াতে আসে, তারাও যখন বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে ব্ল্যাকির ট্রেনিংয়ের নিয়ম জানতে চায় তখন বিল্টুর তেরো-চোদ্দ বছরের মুখ অবিকল সেই ছোটকার জাদুকরের মুখের মতো হয়ে যায়। যেন ব্ল্যাকিকে নিয়ে ও যা খুশি তাই করতে পারে।

আজকাল বিল্টুর বন্ধুদের ওপর আকর্ষণও অনেক কমে গেছে। পড়াশোনা আর ব্ল্যাকির ট্রেনিং নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এখন সে ওকে বাড়ি পাহারা দেওয়া, চোর ধরা এইসব শেখাচ্ছে। ব্ল্যাকির চেহারাই এখন এত বড় হয়ে গেছে যে, অচেনা লোক ওকে দেখেই ভয় পায়। বাড়ির গেটে সাদার ওপর লাল কালিতে "কুকুর হইতে সাবধান" লিখে নিজের হাতেই টাঙিয়ে দিয়েছে বিল্টু। অবশ্য ব্ল্যাকি কাউকে কামড়ায় না। কালো ভাঁর মুখে লাল লাল গম্ভীর চোখে অপছন্দের লোকদের দিকে আড় চোখে তাকালেই তাদের রক্ত হিম হয়ে যায়।

ঘরের একটা ছোট্ট জিনিস তুলে অচেনা তো দূরের কথা, আত্মীয়-স্বজনও বাইরে যেতে পারে না। ব্ল্যাকি ঠিক রাস্তা আটকাবে। গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করে ভয় দেখাবে।

অনিল মামাদের বাড়িতে দু-তিনটে বড় কুকুর আছে। তাই উনি ব্ল্যাকিকে ভয় পান না। দিদু তাঁকে একটা টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার দিয়েছে। অনিলমামা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্ল্যাকি গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করতেও উনি ভয় না পেয়ে বলছিলেন, "যা হ্যাট্, যা ভাগ্।"

ব্ল্যাকি সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর হঠাৎ সামনের দুপা তুলে তাঁর কাঁধের ওপর রেখে এমন ভীষণভাবে দাঁত বের করে গোঁ-গোঁ করে উঠল যে, তিনি ভয়ে হাতের টিফিন ক্যারিয়ার ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকি ঠান্ডা হয়ে নেমে গেল তাঁর কাঁধ থেকে।

দিদু চিৎকার করে বারান্দা থেকে বকে কুকুরের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করলেন। বিল্টু ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। বাবা কোর্ট থেকে ফিরলে কী তুলকালাম কান্ডটাই না হবে! কিন্তু বাবা সব শুনে রাত্তিরে শান্ত মুখে রায় দিলেন যে, ব্ল্যাকি ঠিকই করেছে তার ডিউটি। ও তো আর কামড়ায়নি। ওদিকে ভয়ে ঘুমোবার ভান করে বিছানায় শুয়ে থাকা বিল্টুর চোখে জল এসে গেল।

সেদিন বাবাও তাঁর পুরনো দুই বন্ধুর সামনে বিল্টুকে ডেকে ব্ল্যাকির খেলাগুলো দেখাতে বললেন। চিন্তাই করা যায় না। পাশের ঘরের আলমারির পেছনে ধুলোর মধ্যে লুকোনো বীরেনবাবুর ফাউন্টেন পেনটা ঠিক খুঁজে এনে দিল ব্ল্যাকি। বাবা নিজে হাতে ব্ল্যাকিকে বিস্কুট ভেঙে ভেঙে খাওয়ালেন।

এইসব করেই দিন কাটছে। এখন ব্ল্যাকি প্রায় পুরো মাপের বেড়ে ওঠা একজন অ্যালসেশিয়ান। এখন আর ওকে কুকুরের বাচ্চা বলা যায় না। কানের পাশের লোম বেড়ে, গালের লোম ফুলে, বেশ ভারভারিক্কি হয়েছে। ওর এখন খাবার সকালে এক কাপ দুধ, দু পিস্ পাউরুটি। রাত্তিরেও তাই। দিনে একবার মাত্র পুরো খাবার। বেলা তিনটের সময় ভাত আর হলুদ দেওয়া সেদ্ধ মাংস। ওয়ানস এ ডে। দিনে একবার। কুকুর বড় হয়ে গেলে তাই নিয়ম। একবারের বেশি পেট পুরে খেতে দিলে কুকুর ভোঁতা স্বভাবের হয়ে যায়। এখন তো আর ও বাচ্চা নেই যে দিনে পাঁচ ছ বার খাবে।

এদিকে বাড়িতে কদিন ধরেই কেলেঙ্কারি কান্ড। গরমের সময় বিল্টুর ইস্কুল ছুটি। জন্তু-জানোয়ারদের খাবার মায়ের শোবার ঘরের খাটের তলাতেই থাকে। একটা বড় ভাঁড়ে অরণির জন্য কাবলি মটর ভেজানো। ছোট জলচৌকির ওপর গালুর কলা পেঁপে আর হাবিজাবি সব জিনিস। তা ছাড়াও গরমের ফল, আম-টাম থাকে একটা গামলায়। বিকেলে জলে ভিজিয়ে সন্ধেয় মা বঁটি দিয়ে আঁম কেটে দেয়।

আর পর-পর তিনচার দিন ওই ফল চুরি। কোনো কিনারা নেই। কাল রাত্তিরে ছোটকাটা সব শুনে বলল, "এই তোর ব্ল্যাকির ট্রেনিং বিল্টু? একদিনও ও চোর ধরতে পারে না। বড়-বড় যে কথা বলিস খুব। দ্যাখ বাবা, বৌদি ঘুমুলে তুই নিজেই চুরি করছিস না তো? তোর সুগ্রীব দোসর সেই জন্যেই কি চুপ করে

থাকে?" বলেই চোখ পিট পিট করে এমন এক সন্দেহের হাসি হাসতে লাগল যে, বিল্টুর পিত্তি জ্বলে গেল।

বাড়ির নতুন ছোকরা চাকর রঘুবীর আর ছোটভাই মিল্টুকেই সন্দেহ হল বিল্টুর। মিল্টুটাও ছুঁকছুঁকে আছে খুব। সেবার শিমুলতলার বাগান থেকে আসা গোলাপজামের ঝুড়ি থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশটা চুরি করে একদুপুরে খেয়েছিল। সবাইকে মা পই-পই করে জিজ্ঞেস করল। ও একবারও স্বীকার করল না। কিন্তু পরের দিন বার বার বাথরুমে ছুটতে হল। ব্যাস, ধরা পড়ে গেল। ঠিক আছে, তক্কে তক্কে থাকতে হবে। কে চোর?

ঠিক দুপুর তিনটের সময় গণ্ডগোল বাধল। ব্ল্যাকিকে খাবার দেওয়া হয়েছে। আর মিল্টু অভ্যেস মতো ঝুলঝাড়ার লাঠি দিয়ে তার খাবারের থালা ঠেলে দিয়েছে। আজকে ঠেলাটা একটু জোর হয়ে যেতেই থালা উল্টে ভাত মাংস সব মাটিতে ছত্রাকার। আর ব্ল্যাকি কখনও যা করে না, তাই করল আজ। রাগ সামলাতে না পেরে মিল্টুর কবজিতে দিল এক মোক্ষম কামড়। কবজিতে দাঁত বসে মিল্টু নীল। ও চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল। কাঁদতে কাঁদতেই ও আবার ঝুলঝাড়ার লাঠিটা লুকিয়ে ফেলল সিঁড়ির পেছনে। ঠাকুর ব্ল্যাকিকে খেতে দিচ্ছিল, সে এই কাণ্ডটার সাক্ষী থাকল।

দিদু তো আদরের ছোট নাতির যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে পাড়া ফাটাচ্ছেন। বাবার নাম ধরে চিৎকার করছেন। আজ অমুক আসুক. আগেই বলেছিলাম ঐ অলুক্ষুনে কালো কুকুর দূর কর। তা গরিবের কথা বাসি হলে ফলে। লজ্জায় বিল্টুর মাথা হেঁট। অবশেষে ব্ল্যাকি কিনা কামড়াল। আর কামড়াল তো কামড়াল মিল্টুকেই!

বাবা কোর্ট থেকে ফিরতেই ফ্যামিলি কনফারেন্স। দিদু সওয়াল করলেন, ঐ কুকুর তাড়াও বাড়ি থেকে। ও পাগল হয়ে গেছে। বাড়ির লোককে কামড়াতে শুরু করেছে। এবার কামড়ে কারুর গলার নলি ছিঁড়ে দেবে ঐ বাঘা কুকুর।

ব্ল্যাকি কিন্তু অনুতপ্ত। ও সেই যে সিঁড়ির তলায় ঢুকেছে আর বেরোয়নি। মিল্টুর হাতের কামড় ছোটকা চটপট অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। গোলমালে হট্টগোলে সন্ধ্যা কেটে গেল। ব্ল্যাকি পাগল হচ্ছে কিনা নজর রাখার কড়া নির্দেশ জারি করলেন বাবা। ওকে সিঁড়ির তলাতেই চেনে বেঁধে রাখা হল। ঠাকুর অবশ্য মিল্টুর দোষের কথা আমতা-আমতা করে বলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দিদুর চিৎকারের ঠেলায় চাপা পড়ে গেল। সেই প্রথম রাত্তিরের মতো আজও উদ্বেগে ভাল করে ঘুমোতে পারল না বিল্টু।

পরের দিন রবিবার। বাবা বাড়ি আছেন। সকালবেলা ব্ল্যাকিকে খুব ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখেছেন বাবা। ছোটকাকাকেও বেশ বিষণ্ণ মনে হল। বাড়ি শুদ্ধু শত্তুর। এই শত্রুপুরীতে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আহা মিল্টু যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। বাবাকে দিয়ে গরমের ছুটির অঙ্কের হোমওয়ার্কের খাতা দেখাচ্ছে। বিল্টুর আশিটা অঙ্কের মাত্র একুশটা হয়েছে। বাবা দেখতে চাইলেই চিত্তির। এদিকে ব্ল্যাকির গণ্ডগোল! দূর, যে দিকে দুচোখ যায় চলে যেতে ইচ্ছে করে। ছোটকাটা আবার এমন মন খারাপ করে দিল না! বলল, পাগলা কুকুরকে ধরে নিয়ে গিয়ে নাকি গুলি করে মেরে ফেলা হয়। ব্ল্যাকিকে গুলি! হায় ভগবান। ভাবতেই চোখে জল এসে যায়।

আজ সারা সকাল পালিয়ে বেড়াল বিল্টু। ওর পড়ার টেবিলের তলায় ব্ল্যাকি নেই। ওর পায়ের তলা খালি। ব্ল্যাকি আজ চেনে বাঁধা আছে। এখন সময় দুপুর। সকালে একটু কুঁই মুঁই করে আপত্তি জানিয়েছিল ব্ল্যাকি। ও তো এমনিতে চেনে বাঁধা থাকে না। ও দিদুর ঠাকুরঘর চেনে, তার ভেতরে পা

বাড়ায় না। বাবার মক্কেল বসার ঘরের বাইরে ঘোরে। মক্কেলরা ভয় পায় বলে, ওকে ভেতরে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে বিল্টু।

ও হাতে করে বইখাতা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল ব্ল্যাকি। ওর খাবার দেওয়ার দেরি আছে। বাড়ি আস্তে আস্তে নিঝুম হয়ে আসছে। বাবা দোতলার মাঝের ঘরে খাটের ওপর হ্যাড্‌লি চেসের বই নিয়ে শুয়ে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বেন। নাক ডাকবে। মা কোণের ঘরে। ঘর অন্ধকার না হলে আবার মায়ের ঘুম আসে না। আর দুপুরে একটু না ঘুমোলে বিকেলে মায়ের শরীর খারাপ হয়। ছোট্‌কাটা শিস দিচ্ছে শোনা যাচ্ছে। একটু পরে সিনেমা দেখতে বেরুবে। আর বাড়ির একতলায় ছড়িয়ে আছে নিঝুম দুপুর। কাকের ডাক। পায়রার ডানা ঝাপটানি। পড়ার ঘর। টেবিলে অঙ্কের খোলা খাতা। হাতে কলম। অথচ পায়ের তলায় ব্ল্যাকি নেই। আর একটা কথাই ঘুরে ফিরে মাথার মধ্যে চলে আসছে, কুকুর পাগলা হয়ে গেলে গুলি করে মারা হয়।

বিল্টু আস্তে আস্তে উঠে ব্ল্যাকির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সামনের দু থাবার ওপর মুখ নামিয়ে চুপচাপ ব্ল্যাকি শুয়ে

কী জানতে চাও

মহাকাশ থেকে এই পৃথিবী, যেদিকে তাকাও, যা-কিছু দেখো, এবং সে সম্পর্কে যত প্রশ্ন জাগে তোমার মনে, তার উত্তর এই একটি মাত্র বইয়ের মধ্যে ধরা রয়েছে।

ছোটদের বিশ্বকোষ

বাংলায় এর চেয়ে ভাল 'বুক অব নলেজ' আর কখনও হয়নি। তার কারণ, যিনি যে-বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিত, সেই বিষয়ে তাঁকে দিয়ে এখানে উত্তর লেখানো হয়েছে। তার উপরে আবার

পাতায় পাতায় ছবি

সম্পাদক :

অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মোট পাঁচ খণ্ডে এ-বই সম্পূর্ণ হবে। তার মধ্যে চার খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের দাম ১৬৲ টাকা; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের প্রত্যেকটির দাম ১২৲ টাকা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ

১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২

আছে। বিল্টু স্পষ্ট দেখল ওর দু চোখে জল। ওকে দেখে আস্তে একবার কালো ল্যাজটা নাড়াল।

আস্তে ওর সামনে নিচু হয়ে বসে ওর গলা চুলকে একটু আদর করল বিল্টু। আনন্দে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল ব্ল্যাকি। ঘড় ঘড় করে ও ওর প্রাণের আনন্দ জানিয়ে দিল। সেই মুহূর্তে বিল্টু বুঝতে পারল ও বিন্দুমাত্র পাগল হয়নি। অভিমানে ও দুধ পাউরুটি তো দূরের কথা, একফোঁটা জলও খায়নি।

এদিক ওদিক চেয়ে ওকে চেন থেকে খুলে দিল বিল্টু। ও কিন্তু নড়ল না। পড়ার ঘরের সামনে থেকে ডাকল ওকে। ব্ল্যাকি অভ্যেস মতো লাফিয়ে উঠে দৌড়ে আসতে গিয়েও আবার মোটা মোটা ভারী থাবায় ভর দিয়ে বসে অভিমানে ওর চেনের পাশে থাবায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। ভাবটা এই যে, আমার অসম্মান করে আর বেঁধে রাখতে হবে না, আমি এমনিই চুপ করে শুয়ে থাকব। তোমাদের কাছে যাব না। আমার খাবার দরকার নেই। এই খাবার জন্যেই তো যত গণ্ডগোল।

বাড়ির সবার ওপর অভিমানে চোখে জল এসে গেল বিল্টুর। ও স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, ব্ল্যাকি মানুষ হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে আবার পড়ার ঘরে এসে বসল বিল্টু। ব্ল্যাকি আসেনি। পায়ের তলাটা খালি। হাতের তালুর ওপর মুখ নামিয়ে এতক্ষণের জমা কান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ও।

আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। সারা বাড়িতে কোনো সাড়াশব্দ নেই। এখন একেবারে নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়ি। মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে। বাবাও। হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচিতে চমক ভেঙে গেল বিল্টুর। গালুর চিৎকার, অরণির চিৎকার, সব ছাপিয়ে ব্ল্যাকির ঘেউ ঘেউ। মাও চেঁচাচ্ছে। "আমার খাটের তলা থেকে কে বেরিয়ে দৌড়ল রে।" বাবাও ঘুম চোখে সিঁড়ির গোড়ায়, উঠোনে ব্ল্যাকি গর্‌গর্‌ করছে। আর গালুর ভয়ের চিৎকার। কিচ্‌মিচ্‌।

এক দৌড়ে বাইরে উঠোনে বেরুল বিল্টু। গালু শাল-খুঁটিটার কাছে বোকা বনে দাঁড়িয়ে। হাতে এক ছড়া কলা। ব্ল্যাকি ওকে হাতেনাতে ধরেছে। ধমকাচ্ছে। ও গালুর ডোরাকাটা ইজের দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে। কামড়ায়নি। আর গালু ধরা পড়ে গিয়ে বোকা বনে হাতে কলার ছড়া ধরে দাঁড়িয়ে। ওর বাক্সের ঘরে পালাতে পারছে না।

বাবাও বাইরে বেরিয়ে ও'র আদরের গালু চোরকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন। আর বলছেন, "গালু গলার চেন খুলল কী করে! কে ছেড়ে দিল?"

ব্ল্যাকিকে টেনে গালুর কাছ থেকে সরিয়ে আনল বিল্টু। আর বাবার সব প্রশ্নের উত্তর সব লোকের থমকানো দৃষ্টির সামনে গালুই দিয়ে দিল।

ব্ল্যাকিকে টেনে সরাতেই গালু চকিতে হাত দিয়ে খোঁটায় বাঁধা চেনটা নিজের গলার বকলসে টিপে আটকে নিল। তারপর তরতর করে খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠে নিজের ঘরের বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসল।

এইবার সমস্ত ব্যাপারটা বোঝা গেল। বাবা সস্নেহ দৃষ্টিতে ব্ল্যাকির দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাবাশ্‌!" হাত দিয়ে মাথা থাবড়ে একটু আদর করে দিলেন।

ব্ল্যাকি নাক দিয়ে বিল্টুকে একটু ঘষে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে অরণিটা চিৎকার করল. "আ মোলো, সরে যা।"

ছবি/সুধীর মৈত্র

প্রজাপতি! প্রজাপতি!

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এইমাত্র ছোট্ট প্রজাপতিটা গুটির বলটা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল ভোরবেলার আলোয়। ঝিরঝিরে বাতাস লাগল তার পাতলা-পাতলা রঙিন দুটো ডানায়। চারধারের গাছপালা, ফুল দেখে আর বাগানের মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ পেয়ে সে বড্ড হকচকিয়ে গেছে। এসব তো সে কখনও দেখেনি, তাই ভারি অবাক লাগছে তার। যখন সে ছিল একটা নিতান্তই শুঁয়াপোকা, তখন অবশ্য এই বাগানেই সে শুধু খাই-খাই করে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু সে-সব কথা তার আর এখন মনে নেই। এইমাত্র সে আবার নতুন করে জন্মাল ঐ সুন্দর নীল আকাশের তলায়, একটা সবুজ পাতার ওপর। এখন সে আর একটা বিচ্ছিরি, নিড়বিড়ে পোকা নয়। সে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর প্রাণীদের একজন।

কিন্তু তার এখন খুব ভয় করছে। কাছে তো তার বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। আসলে প্রজাপতিদের তো আর পাখির বাচ্চাদের মতো মা-বাবা থাকে না। থাকবেই বা কী করে? মা প্রজাপতির ডিম থেকে তো আর ছোট্ট সুন্দর বাচ্চা একটা প্রজাপতি বেরিয়ে এসে হঠাৎ ফুলে-ফুলে উড়তে শুরু করে না। মা প্রজাপতির ডিম থেকে যে বেরিয়ে আসে সে একেবারেই তার মা-বাবার মতো দেখতে নয়। ডিম থেকে বেরিয়ে আসে হাড়-কুচ্ছিত একটা পোকা, যার একটা নাম পর্যন্ত নেই। নিশ্বাস নেবার জন্যে আছে শুধু তার লম্বা সরু দেহটার দু-পাশে কয়েকটা ফুটো। এই পোকাটার ইংরেজি নাম দুটো কিন্তু ভারি জব্বর—ক্যাটারপিলার আর লারভা।

কোনো প্রজাপতিই এই ছোট্ট বিশ্রী পোকাটাকে তাদের আত্মীয় বলে মনে করে না। পোকাটা একা-একা বাগানে ঘুরে বেড়ায়। আর, খাওয়া ছাড়া সে অন্য কিচ্ছু বোঝে না। গাছ-পালা ফুল ফল সবকিছু থেকে সে শুধু রস শুষে নেয় রাত-দিন। আর এইসব খাবার থেকে তার দেহের মধ্যে প্রচুর চর্বি জমতে থাকে।

তারপর একদিন কী হয় জানো? ঐ পোকাটা তার মুখের লালা দিয়ে তার নিজের চারধারে একটা গোল বলের মতো জিনিস বুনতে থাকে। বলটা বাতাস লেগে-লেগে শক্ত হয়ে যায়। আর পোকাটা তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। পোকাটা যে কত-দিন ঘুমোবে সেটা নির্ভর করে সে কোন জাতের প্রজাপতি হয়ে জন্মাবে তার ওপর। কোনো-কোনো সময়ে এই ঘুম কয়েক বছর পর্যন্ত চলতে পারে। এই ঘুমন্ত পোকাটাকে কিন্তু আর লারভা বলা হয় না। বলা হয় পুপা। পুপা মানে পুতুল। অর্থাৎ পুতুলের মতো ছোট্ট ঘুমন্ত প্রজাপতি।

আচ্ছা, ছোট্ট পুপা যে এতদিন ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে সে খাওয়া দাওয়া করে কী করে? গুটির মধ্যে ঘুমন্ত পুপা একেবারেই খায় না। সে যখন পোকা ছিল তখন সে এতই খেয়েছিল যে, সে-সব তার মধ্যে চর্বি হয়ে জমা আছে। তার আর খাবার দরকার হয় না। গুটির বলটা কিন্তু একেবারে নিরেট নয়। তার মধ্যে ছোট ছোট অনেক ফুটো আছে যেখান দিয়ে ভেতরে বাতাস ঢুকতে পারে।

এইমাত্র যে প্রজাপতিটা গুটি থেকে বেরিয়ে ভোরবেলায় বাতাসে তার নরম ভিজে ভিজে ডানা দুটোকে শুকিয়ে নিচ্ছে সেও কিছুক্ষণ আগে ঐ গুটিটার মধ্যে পুপা হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আর এই ঘুমন্ত অবস্থায় সে ক্রমশ সুন্দর হয়ে উঠতে-উঠতে একটা প্রজাপতি হয়ে গেছে আর অমনি মধুর গন্ধ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে পৃথিবীর আকাশের তলায়। এখন তাকে কেউ আর বিচ্ছিরি একটা পোকা বলে ঘেন্না করছে না। সবাই বলছে, সে কত সুন্দর।

সে তো গুটি থেকে এইমাত্র বেরিয়েছে, সুতরাং এখনও কোনো বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কিন্তু এখুনি তার সঙ্গে ভাব করতে আসবে অন্য অনেক রঙ-বেরঙের প্রজাপতি। পৃথিবীতে কত রকমের প্রজাপতি আছে জানো? বারো হাজারেরও বেশি।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রজাপতি আছে দক্ষিণ আমেরিকায়। বৃষ্টি হয়ে যাবার পর যখন ভিজে-ভিজে মাটির ওপর পাতলা নীল আকাশ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস নেমে আসে

পাতা ওলটালেই রঙিন ছবি

তখন ঝাঁকে-ঝাঁকে প্রজাপতি দক্ষিণ আমেরিকার নদীর তীরে-তীরে কিংবা সবুজ উপত্যকায় মেলা বসিয়ে দেয়।

আমাদের দেশেও কিন্তু প্রজাপতিদের মেলা বসে নানান জায়গায়। ভারতবর্ষে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে প্রজাপতি নেই। হিমালয়ের ঠাণ্ডা সাদা বরফের মধ্যেও রঙিন প্রজাপতিদের দেখা যায়।

শুধু নিউজিল্যান্ডে প্রজাপতি প্রায় নেই বললেই চলে। এ পর্যন্ত মাত্র আঠারো রকম প্রজাপতি দেখা গেছে সেখানে। পৃথিবীর এক কোণের এই দেশটি চারধারে বিশাল সমুদ্র দিয়ে এমনি ঘেরা যে, প্রজাপতিরা বোধ হয় সেখানে পৌঁছতে পারে না।

প্রজাপতিরা শুধু সুন্দর-ই নয়, তারা মানুষের কাজেও লাগে। যেমন, লারভার লালা দিয়ে তৈরি গুটি থেকে মানুষ বানায় রেশম বা সিলকের সুতো। প্রজাপতিদের বিষয়ে সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হল, তারা প্রায় শুনতেই পায় না। আমার মনে হয়, পৃথিবীর কোনো শব্দই তাদের জ্বালাতন করে না বলে তারা সব সময়ে অমন নিশ্চিন্ত আর খুশি। প্রজাপতিদের মেলায় এসে দেখো, তাদের দুঃখ নেই।

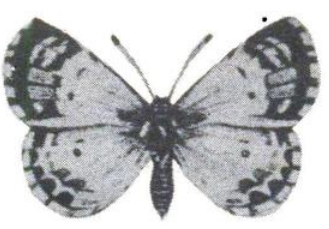

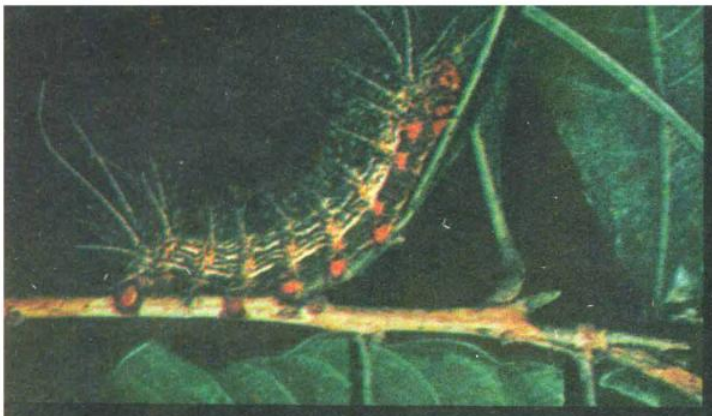

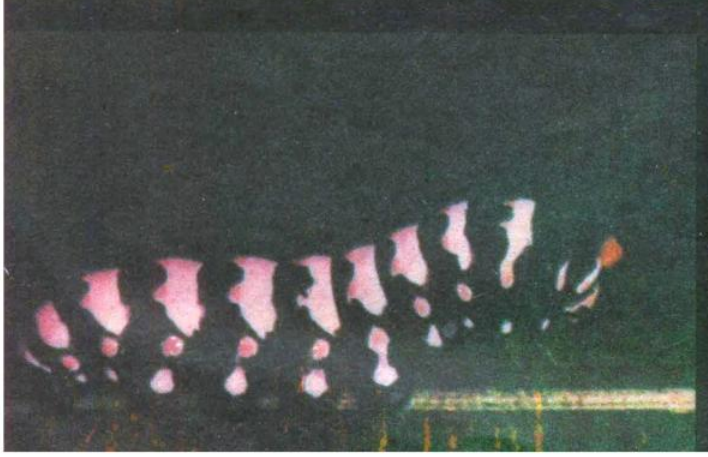

ডোডো তাতাই

লেখা/তারাপদ রায়
রেখা/কৃত্তিবাস রায়

"গিটকিরি" শব্দটি খুবই সামান্য, কিন্তু এর মানেটা সাংঘাতিক। তাতাইবাবু বাইরের ঘরে নিজের টেবিলে বসে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে মুখস্থ করছিলেন, "গিটকিরি, অর্থাৎ সঙ্গীত মনোহর করিবার জন্য একাধিক সুরের পরপর দ্রুত উচ্চারণ।" যতটা চেঁচিয়ে পড়ছিলেন ঠিক ততটা মনোযোগ ছিল না, বাঁ পাশে সামনের দরজা দিয়ে ডোডোবাবু ঢুকতেই তাতাইবাবু একবার মাথা ফিরিয়ে দেখে রোলকল করার মত করে ডেকে উঠলেন, "চার নয়।"

চার নয় মানে চার ফুট নয় ইঞ্চি। তাতাইবাবু বাইরের ঘরের দরজায় স্কেলকাঠি দিয়ে মেপে রঙীন প্যাস্টেল দিয়ে এক ফুট থেকে ছয় ফুট পর্যন্ত দাগিয়ে রেখেছেন। যে কেউ দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে, তাতাইবাবু এক নজরে দেখে নেন উচ্চতা কত।

ডোডোবাবু তাতাইবাবু এখন হুহু করে লম্বা হচ্ছেন, দু তিন মাস পরে কেউ যদি তাঁদের দেখে সঙ্গে-সঙ্গে বলে, "আরে, আপনারা আরেকটু বেড়েছেন দেখছি।" দুজনেই বাড়ছেন, এর মধ্যে ডোডোবাবুর লম্বা হওয়ার গতিটা খুবই তীব্র, দোকান থেকে কিনে বাড়ি পর্যন্ত আনতে আনতে তাঁর শার্ট-প্যান্ট ছোট হয়ে যায়। তাতাইবাবু অল্পদিন আগে একটা গল্পে পড়েছেন একজন অতি-লম্বা লোককে তার আশেপাশের সবাই জিজ্ঞাসা করত, "দাদা, ওপরের জলবায়ু কীরকম?" তাতাইবাবুর ধারণা অল্পদিনের মধ্যেই ডোডোবাবুকে লোকজন ঐরকম সব প্রশ্ন করতে শুরু করবে। এই তো সরস্বতী পুজোর সময় ডোডোবাবু ছিলেন চার-সাত, এরই মধ্যে দু ইঞ্চি উঠে গেছেন।

দরজায় লম্বা হওয়ার হিসেব রাখার খুব সুবিধে। তাতাইবাবু নামের পাশে তারিখ লিখে রাখেন, পরে মাপবার সময় আগের তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই হল। তাতাইবাবু তাঁর বাপ মা সবাইকার উচ্চতার পাশেও তারিখ লিখে রেখেছেন, দুঃখের কথা তাঁদের কোনো বাড় নেই, যেখানে আছেন আটকে গেছেন। তাতাইবাবুর বিশ্বাস, যদি বেড়ে যাওয়া ঠিকমত চলে, তবে ডোডো-বাবু তো বটেই, তিনিও ঐ আটকিয়ে যাওয়া মানুষদের অল্পকালের মধ্যেই ডিঙিয়ে উঠে যাবেন।

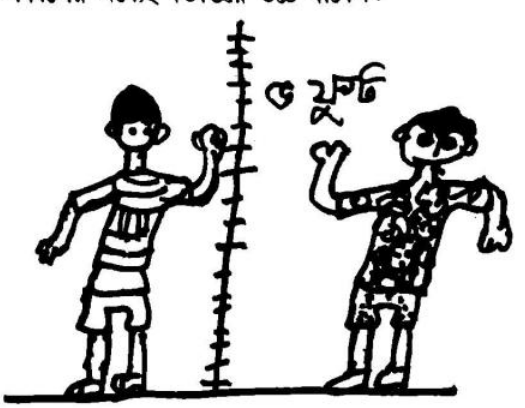

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

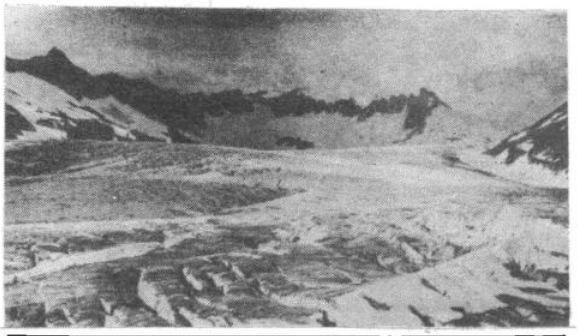

হিমবাহ

হিমবাহ প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি, কিন্তু অনেকেরই জানা নেই হিমবাহ কাকে বলে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মহা-দেশেই উঁচু উঁচু পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের ওপর বছরের পর বছর বরফ জমতে থাকে। পাহাড়ের চূড়োয় এত ঠাণ্ডা যে, সেই বরফ গরমকালেও গলে যায় না। যে রেখার ওপরে গরম-কালেও বরফ গলে যায় না, তাকে বলা হয় হিমরেখা, আর হিমরেখার ওপর যেখানে বরফ জমে, তাকে বলা হয় হিমক্ষেত্র। এই হিমক্ষেত্র থেকে ওপরের বরফের স্তরের চাপে আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নীচের বরফের স্তর পাহাড়ের উপত্যকা বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। এই বরফের প্রবাহকেই বলা হয় হিমবাহ বা বরফের নদী। হিমবাহ যে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না, সচল, একথা প্রথম আবিষ্কার করেন একজন সুইস্ ভূবিজ্ঞানী। তাঁর নাম লুই এগামিম্। পৃথিবীর সব-চেয়ে গতিশীল হিমবাহ হল গ্রীনল্যান্ডের হিমবাহগুলি। গরমকালে এগুলি এক-একদিনে ৬০ ফুট পর্যন্ত এগিয়ে যায় আবার পৃথিবীর বিশালতম হিমবাহ অ্যান্টার্কটিকার বিয়ার্ড-মোর গ্লেসিয়ার দিনে তিন ফুটেরও কম অগ্রসর হয়।

হিমবাহের সৃষ্টি যে শুধু পাহাড়েই, তা নয়। যেখানে স্থায়ী হিমক্ষেত্র আছে যেমন অ্যান্টার্কটিকা, গ্রীনল্যান্ড, সেইখানেই হিমবাহের দেখা পাওয়া যায়। যে হিমবাহ সারা মহাদেশ জুড়ে থাকে, তাকে মহাদেশীয় হিমবাহ বলে, যে হিমবাহ পাহাড়ের উপত্যকা বেয়ে নামে তাকে উপত্যকা হিমবাহ বলে। পৃথিবীতে এমন হিমযুগ অন্তত দুবার এসেছে, যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মহাদেশই বরফের তলায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আজ থেকে পঁচিশ কিংবা তিরিশ হাজার বছর আগে এই ধরনের মহাদেশীয় হিমবাহ উত্তর আমেরিকার অর্ধাংশ ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ঢেকে রেখেছিল।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হিমবাহ যখন নীচের দিকে নামে, তখন তাকে এক বিশাল জিহ্বার মতো মনে হয়। জিহ্বাকৃতি হিমবাহ উপত্যকা বেয়ে গলতে-গলতে নীচের দিকে নামতে থাকে, এবং অনেক সময় যেখান থেকে শুরু হয়েছিল তার থেকে হাজার-হাজার ফুট নীচে নেমে ক্রমশ উত্তাপের ফলে গলে যায়। মেরু-বৃত্তের বাইরে পামীরেই পৃথিবীর বৃহত্তম হিমবাহ আছে। এই বিশালকায় বরফের জিহ্বা বা নদী যখন পাহাড়ের উপত্যকা বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে তখন ভূপ্রকৃতির অনেক পরিবর্তন করতে থাকে। বরফ সব এবড়ো-খেবড়ো জায়গাকে শিরিষ কাগজের মতো ঘষে ফেলে মসৃণ করে দেয়, অনেক জায়গায় গর্তের মধ্যে হ্রদ সৃষ্টি করে। অনেক জায়গায় দেখা যায় ছোট ছোট হিমবাহ এসে বড় হিমবাহতে মিশেছে। যেখানে ছোট হিমবাহের জল অনেক উঁচু থেকে নীচের মুখ্য হিমবাহের উপত্যকায় এসে মিশেছে তাকে বলা হয় ঝুলন্ত উপত্যকা। হিমবাহের সৃষ্টি করা উপত্যকা খুব চওড়া হয়— দেখতে অনেকটা ইংরিজি 'U' অক্ষরের মতো। হিমবাহ তার জলের সঙ্গে বহন করা পাথর, নুড়ি, মাটি ইত্যাদির সঞ্চয় তার যাত্রা-পথের দুপাশে, এবং যেখানে হিমবাহ সম্পূর্ণ গলে যায় সেইখানে জমা করে।

ইচ্ছাপূরণ

যদি পৃথিবীতে একটি লোকের ক্ষমতা থাকত যে, তার যা ইচ্ছে সে তাই ঘটাতে পারে, তাহলে কী মজা হত, তাই না? ধরো, তুমি দুষ্টুমি করেছ, তোমার মা তাই তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন, তুমি পাখি হয়ে জানলা দিয়ে পালিয়ে গেলে, তোমার মা বুঝতেই পারলেন না। বিকেলে এসে দরজা খুলে দেখতেন, তুমি নেই। তারপর তোমার ঘরে গিয়ে দেখতেন যে, তুমি সেখানে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করছ। তোমার মা বলতেন, "কী করে এলে?" তুমি বলতে, "ম্যাজিক।' তাহলে কী মজা হত, তাই না? ধরো, তোমার মার জ্বর হয়েছে। তোমার একদম ভাল লাগছে না। তুমি তখন বললে, মার জ্বর সেরে যাক। যেই না বলা অমনি তোমার মার জ্বর-টর কোথায় চলে গেল। তাহলে কী মজাটাই না হত! ধরো, তুমি ইস্কুলে সহজ পাঠ নিয়ে যেতে ভুলে গেছ, তখন তুমি বলতে, "সহজ পাঠ, তুই আমার হাতে চলে আয়।" অমনি সহজ পাঠ হাতে চলে এল। তখন কী মজাই হত! ধরো, তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ। শীতের দিন। তুমি দেখলে যে একটি গরিব ছেলে খালি গায়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তুমি বললে, "ছেলেটির গায়ে গরম জামা-কাপড় হয়ে যাক।" অমনি ছেলেটির গায়ে সুন্দর সব গরম জামা হয়ে গেল। ছেলেটি বলল, "কী করে করলে?" তুমি বলতে, "জাদু জানি।" তাহলে কী মজা হত, না? কিন্তু পৃথিবীতে সকলেরই যদি এই ক্ষমতা থাকত, তাহলে কিন্তু মজা হত না। কেন হত না জান? কারণ তাহলে পৃথিবীতে কোনো নিয়মই থাকত না। সবাই যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। ভালও হত না, আবার মজাও হত না।

নন্দন দেব সেন (বয়স ৮)

প্রাচীন যুগের কথা

আমরা প্রাচীন যুগের মানুষের কথা তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র, তাদের কঙ্কাল, ছবি ইত্যাদি থেকে জানতে পারি। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটি খুঁড়ে জানতে পেরেছেন, আদিম মানুষেরা শুধু মাটি ও পাথরের ব্যবহারই জানত। তাই সে যুগের নাম হয়েছে প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগকেও দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পুরোনো প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ। সব থেকে নিচু স্তরের মাটি খুঁড়ে পুরোনো প্রস্তর যুগের কথা জানা যায়। সে যুগের অধিবাসীদের তৈরি ভোঁতা অস্ত্র থেকে জানা যায় যে, তারা ছুঁচলো অস্ত্র তৈরি করতে জানত না। তাদের কঙ্কাল দেখে বোঝা যায়, তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত। আমরা জানতে পারি, তারা পশুপালন ও চাষবাস জানত না। আর একটু উপরের স্তরের মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় নব্য প্রস্তর যুগ। ছুঁচলো অস্ত্রশস্ত্র থেকে জানা যায়, তারা চোখা অস্ত্র তৈরি করতে জানত। মাটির তৈরি পাত্র থেকে জানা যায়, তারা বাসন বানাতেও জানত। তাদের আঁকা ছবি থেকে জানা যায়, তারা ছবি আঁকতেও পারত। স্পেনের আলতামিরা গুহায় এই রকম ছবি পাওয়া যায়। এছাড়া তারা পশুপালন ও চাষবাস করতে জানত।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রাচীনতম পাঁচটি সভ্যতার কথা জানতে পেরেছেন। মাটি খুঁড়ে তাঁরা অনেক দোতলা বাড়ি পেয়েছেন, এর থেকে জানা যায় তখনকার লোকেরা পাকা বাড়ি করতে জানত। নর্দমা, স্নানের ঘর থেকে জানা যায় স্বাস্থ্যের প্রতি তাদের লক্ষ ছিল। তারা লিখতেও পারত। নানা রকম শীলমোহর থেকে জানা যায় তারা মুদ্রার ব্যবহার জানত। তাদের বাচ্চাদের চাকা-ওয়ালা খেলনা থেকে জানা যায় যে, তারা চাকার ব্যবহার জানত। তাদের তৈরি নানা রকম খেলনা ও মাটির পাত্রের উপর সুন্দর কারুকার্য থেকে তাদের শিল্পনৈপুণ্যের কথা জানা যায়।

প্রাচীনকালের অনেক পুঁথিপত্র থেকেও পুরাতাত্ত্বিকেরা অনেক কথা জেনেছেন। গ্রীকদের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' থেকে ট্রয় যুদ্ধের কথা জানা যায়। আমাদের দেশের 'বেদ' ও 'উপনিষদ' থেকে প্রাচীন কালের যাগযজ্ঞের কথা জানা যায়। আমাদের মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' থেকে আর্যদের জীবনযাত্রা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা জানা যায়।

আস্তে আস্তে বিভিন্ন রাজ্যের রাজা নিযুক্ত হল। সেই সব রাজ্যে মুদ্রার প্রচলন ছিল। প্রাচীন কালের অনেক মুদ্রা খুঁজে পাওয়া গেছে। অনেক মুদ্রায় সমসাময়িক রাজাদের মুখের ছাপ, সাল, তারিখ এইসব লেখা আছে। এর থেকে মুদ্রাটি কোন সময়ের তা জানা যায়।

কুমারকান্তি ঘোষ (বয়স ১৩)

চিঠি

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। "সবুজ দ্বীপের রাজা" ভাল লেগেছে। এবার সত্যজিৎ রায় কিংবা লীলা মজুমদারের কোনো উপন্যাস ছাপলে ভাল হয়। অনেকে পত্রিকাটিকে পাক্ষিক করার অনুরোধ করেছেন, আমার কিন্তু এতে মত নেই। সারা মাস ধরে পরের মাসের আনন্দমেলার জন্যে অপেক্ষা করতে খুব মজা লাগে। এই পত্রিকাটির গল্প এবং নিয়মিত বিভাগগুলি এত সুন্দর যে বারবার পড়লেও একঘেয়ে লাগে না, তাছাড়া ভয় হয়, তাড়াতাড়ি বার করতে গিয়ে যদি পত্রিকাটি খারাপ হয়ে যায়!

অরিজিৎ দাশগুপ্ত (বয়স—১৩)

জোয়ান

এক যে ছিল মস্ত জোয়ান
দোকানে খেঁজে পান ও যোয়ান
জর্দা ছিল পানে
ভেজাল যোয়ানে
ভেজাল খেয়ে বলে জোয়ান
বেরিয়ে গেল আমার প্রাণ।

জ্ঞানবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বয়স—১০)

মিকু

মিকুটা সেয়ানা ভারী
মিকু ভারী দুষ্টু
মাছ খেয়ে মাছ খেয়ে
হয়েছে পুরুষ্টু।
অনেক করেছি মানা
করিসনে দস্যিপানা
মিকু শোনে না।

সৌমিত্র বিশ্বাস (বয়স—১১)

চালতাতলার বুড়ি

এক যে ছিল বুড়ি
সে যায় গুড়ি গুড়ি।
তার মাথায় চুল পাকা,
তার হাতের লাঠি বাঁকা।
তার চালতাতলায় বাড়ি,
সে খায় তেল মুড়ি।

কৌশিক চৌধুরী (বয়স—৭)

বাঘের দুঃখ

আমি একটি বাঘ। আমি বাস করতাম সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে। আমার কপাল মন্দ। আমি এখন একটা চিড়িয়াখানায়। সকালে আমাকে কিছু মাংস খেতে দেওয়া হয়, তাতে কিন্তু আমার পেট ভরে না। ছোট ছেলেরা ঢিল মারে। আমার মনে হয়, ওদের ঘাড় মটকে দিই, কিন্তু পারি না। আমার সব সময় সুন্দরবনের কথা মনে পড়ে।

সুশীল চক্রবর্তী (বয়স—৯)

ছবি এঁকেছে সমীর সরকার (বয়স ৮)

অন্নদাশঙ্কর রায়

আগুন! আগুন!

রাত বারোটা
কাঁচা ঘুমটা হয়নি পাকা
পালং থেকে
লম্ফ দিলেন নাগরা কাকা।
পাশেই গোয়াল
শোর তুললেন, আগুন! আগুন!
তন্দ্রাঘোরে
বাবা শুনলেন, জাগুন! জাগুন!
ঘুম ছুটে যায়
চেয়ে দেখি চালের কোণে
সিঁদুর ফোঁটা
বাড়ছে যেন ক্ষণে ক্ষণে।

আঁধার ঘরে
আলোর লহর দেখতে খাসা
কিন্তু ও যে
এক নিমেষেই পোড়ায় বাসা।
এক দৌড়ে
এক কাপড়ে পালাই দূরে
লেপ কম্বল
সব সম্বল যায় রে পুড়ে।
টিলার উপর
দেখি বসে, শীতে কাতর
আগুন কেমন
লাফ দিয়ে যায় ঘর থেকে ঘর।
বাঁশ ফটাফট
হাম্বা হাম্বা গোরুর কাঁদন
ক্ষিপ্র হাতে
কাকা কাটেন গলার বাঁধন।
কেউ বা ছোটে
জল আনতে কুয়োর কাছে
কেউ বা হানে
ডালসুদ্ধ কলাগাছে।
পাড়ার লোকের
উপায় কত চেষ্টা কত
আগুন তবু
হয় না তাতে পরাহত।
পৌষ মাসেই
ঘটে কারো সর্বনাশ
মানুষ বাঁচে
বাঁচে না তার বসন বাস।
বাবা আমার
লড়তে লড়তে কী হয়রান!
কাকা আমার
পাগল হয়ে বুক চাপড়ান।
ছাড়া পেয়ে
বর্তে গেছে অন্য সবাই
কিন্তু, আহা!
বাঁচেনিকো কয়েকটি গাই।
ভস্ম গোয়াল
আছে শুয়ে জ্যান্ত ধরন
ছায়া ধেনু
ছাই দিয়ে তার কায়ার গড়ন।

ছবি/পূর্ণেন্দু পত্রী

আটখানা

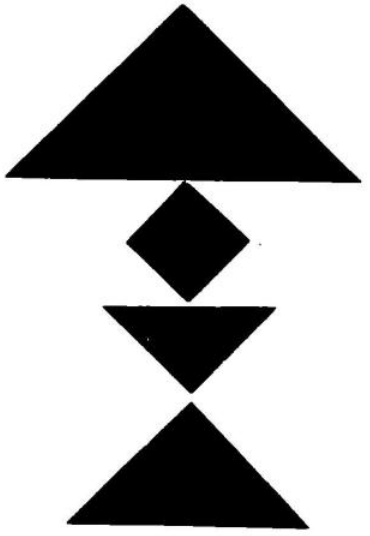

আট টুকরো দিয়ে বানানো এই ছবিটা কিসের তোমরা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছ? এটা একটা টেবিল ল্যাম্পের ছবি। এই ধরনের টেবিল ল্যাম্প সাধারণত ঘরের এক কোণে রাখা হয়। ছবির এই আটটা টুকরো তোমরা আলাদা করতে পার কিনা চেষ্টা করে দেখ। কিংবা এক কাজ করো, তোমরা তো ইতিমধ্যে আটটা টুকরো বানিয়ে নিয়েছ। তাই দিয়ে এই টেবিল ল্যাম্পটি বানাও। যদি না পার তো আগামী সংখ্যায় সমাধান দেখে নিও।

গতবারের উত্তর

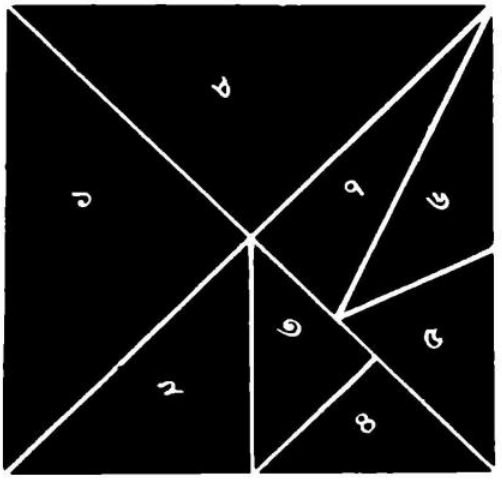

ধাঁধা

"নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে যে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে কে জানত !" ছোট্কা জামা খুলতে খুলতে বলল, "উঃ। সে এক কাণ্ড সতুবাবু।"

পাঞ্জাবিটা খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে ঘরের কোণে রেখে দিল ছোটকা। ফেরার পথে পাখাটা একটু জোরে চালিয়ে এসে বসল।

বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে কী করে গোয়েন্দাগিরির চান্স পেল ছোটকা—খুব জানতে ইচ্ছে করছিল আমার। তাই, কথা না বাড়িয়ে, চুপ করে থাকি। ছোটকা নিজেই শুরু করল সেই গল্প।

ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। ছোটকার বলা ঘটনাটাকেই একটু সাজিয়ে গুছিয়ে এবারের **প্রথম ধাঁধা।**

একটা চুরির ঘটনা। দুপুরবেলা ঘটেছে চুরিটা। টেবিলের ওপর মানিব্যাগ রেখে বিয়েবাড়ির এক কর্তা-মশাই একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল। সেই ফাঁকে কেউ ব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছে।

পাঁচজনকে সন্দেহ করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। সন্দেহভাজন পাঁচজনের নাম—লীলাবতী, যুধিষ্ঠির, দুলাল, তিনকড়ি এবং মানদা। জেরার উত্তরে প্রত্যেকে তিনটি করে বিবৃতি দিয়েছে—তিনটি করে বাক্যে। নীচে বাক্য তিনটি দেওয়া হল। তিনটির মধ্যে আবার প্রত্যেকের একটি করে বাক্য মিথ্যে—পরে তারা

নিজেরাই স্বীকার করেছে। এইটেই সমাধানের সূত্র। অর্থাৎ কার কোন্ বাক্যটি মিথ্যে বুদ্ধি খাটিয়ে বার করতে পারলেই চোরের নামটি জানা যাবে। চেষ্টা করে দেখ তো, কে চোর তা বার করতে পার কিনা।

যুধিষ্ঠির ॥ আমি ব্যাগটা নিইনি। মানদা জানে কে নিয়েছে। টাকার অভাব নেই আমার।

লীলাবতী ॥ আমি চুরি করিনি। জীবনে কখনো কোনকিছু চুরি করিনি আমি। এটা তিনকড়ির কাজ।

তিনকড়ি ॥ আমি চোর নই। লীলাবতী মিথ্যে করে বলেছে যে, আমি চুরি করেছি। মানদাই চোর।

দুলাল ॥ আমি ব্যাগের কথা জানি না। মানদাকে আমি আগে কখনো দেখিনি। ব্যাগটা সরিয়েছে তিনকড়ি।

মানদা ॥ আমি ব্যাগ সরাইনি। যুধিষ্ঠির নির্ঘাত দোষী। দুলাল আমাকে গত দশ বছর ধরে চেনে।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ স্কুলে যাবার পথে রোজই এক চৌ-রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ায় একটি ছেলে। চৌমাথার ডান-হাতি রাস্তাটা ধরে গেলে একটা মন্দির পড়বে। সোজা রাস্তায় এগোলে একটা নদী। স্কুল যে-দিকে সে-দিকে নদীও নেই, মন্দিরও পড়ে না। ছেলেটির বাড়ি যে দক্ষিণ দিকে সে জানে। তার স্কুল কোন দিকে? পুবে? পশ্চিমে? না উত্তরে?

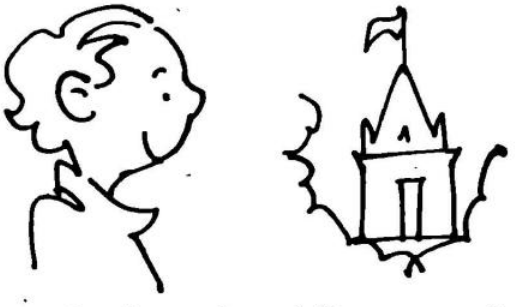

তৃতীয় ধাঁধা ॥ নীচের পাঁচটি সংখ্যা মন দিয়ে লক্ষ করো। তারপর বলো, ষষ্ঠ সংখ্যাটি কত হবে?

৪, ৫, ৭, ১১, ১৯, ?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ একটা ডিম সেদ্ধ করতে যদি ১০ মিনিট সময় লাগে, চারটে ডিম একসঙ্গে সেদ্ধ করতে কত মিনিট সময় লাগবে? খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে কিন্তু!

গতবারের উত্তর ॥ (১) প্রথমজন সত্যবাদী নয়। কেননা সত্যবাদী হলে মাঝখানের জনকে সে 'সত্যবাদী' বলত না। মাঝখানের লোকটিও সত্যবাদী নয়। কেননা, সত্যবাদী নিজেকে 'মধ্যবাদী' বলবে না। সুতরাং তৃতীয় অর্থাৎ শেষের জনই সত্যবাদী। তাহলে, তার কথা অনুসারে, মাঝখানের লোকটি মিথ্যেবাদী। প্রথম লোকটি মধ্যবাদী।

(২) এক জাতের আম কমপক্ষে দুটো তুলতে গেলে ঝুড়ি থেকে অন্তত চারটে আম তুলতে হবে। এবং সাতটা আম তুললে এক-জাতের কমপক্ষে তিনটে আম থাকার নিশ্চিতি মিলবে। (৪) লোকটির ঘুম এক ঘণ্টা বাদেই ভেঙে যাবে, কেননা সন্ধে ছটায় শুয়েছে সে, আর অ্যালার্ম দেওয়া রয়েছে সাতটার সময়। অ্যালার্মের তো আর সকাল-সন্ধে নেই!

আর তিন নম্বর ধাঁধার উত্তর? খালি পেটে রসগোল্লা খেয়ে দেখলে নাকি? কটা খেলে? অনেক? কী করে হবে! একদম খালি পেটে তো একটার বেশি রসগোল্লা খাওয়া যাবে না। কারণ, একটা খাওয়ার পরেই তো আর 'একদম খালি পেট' থাকছে না!

সত্যসন্ধ ছবি/অহিভূষণ মালিক

কিসের ফটো

উত্তর আগামী সংখ্যায়/ছবি তুলেছেন তপন দাশ

গতবারে ছিল মনুমেন্টের ছবি। নীচের দিক থেকে তোলা। গোড়া তাই মাথাকে অনেকটা আড়াল করে দিয়েছে।

কিসের ছবি

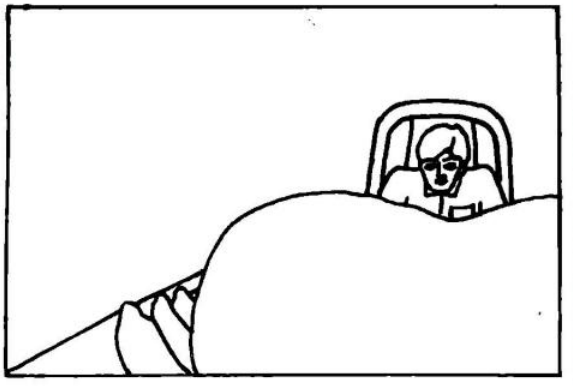

এবারের ছবিতে যা আছে তা যদি সত্যি হয় তোমরা বোধ হয় চোখ বড়-বড় করে ধরার জন্যে এগিয়ে আসবে। খুব লোভনীয় জিনিস। কী, ধৈর্য ধরতে পারছ না ? ঠিক আছে, যেখান থেকে ছবিটা এঁকেছি সেখানে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। খাবার ঘরে চলে এসো, এখানে সবাই মিলে টেবিলে বসে খায়। টেবিলের ওদিকে বসে একজন মাথা নিচু করে একমনে খেয়ে যাচ্ছেন, উনি বোধ হয় আমাদের দেখেননি। আর সামনে! আপেল, কলা এবং আরও কত রকমের ফল আছে। সামনের জিনিস দূরের জিনিসের তুলনায় বরাবরই বড় লাগে। লাগুক। আপাতত আমরা ছবির কলা ও আপেল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি।

শব্দ-সন্ধান

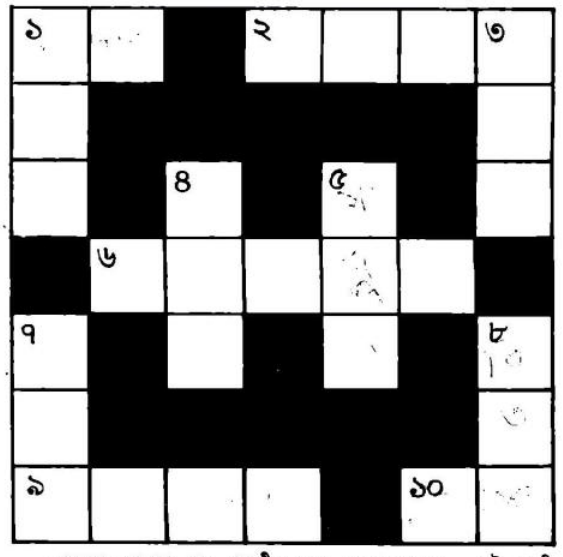

এবারে দেওয়া হল 'নদীমাতৃক' শব্দ-সন্ধান। এই নদী-মাতৃক দেশের ছেলেমেয়েরা যদি নদী নিয়েই একটা শব্দ-সন্ধান না করল তবে আর নদী বইছে কেন?

সংকেত : পাশাপাশি : (১) এই নদীকে বলা হয় আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের দুঃখ। (২) নদী, তোমার জল তো কেউ ঢেকে রাখেনি, তবে কেন অমন নাম? (৬) নাম শুনলে কোন্ আশ্রমের কথা মনে পড়ে? (৯) কোন্ নদীর উপত্যকার নামে কর্পোরেশন আছে? (১০) করতোয়া, আত্রাই ও পুনর্ভবা—এই তিন ধারা নিয়ে কোন্ নদী?

উপর-নীচ : (১) কোদাল হাতে নিলেই মনে হয় এই কাজটা করি। (৩) এই নদীর জলপ্রপাত ভারতবিখ্যাত। (৪) একটা রেখা জুড়ে দিলেই এই নদীতে পেয়ে যাবে দুটি জল-প্রপাত। (৫) নবাবী আমলের অনেক নিদর্শন রয়েছে এই নদীর তীরের এক বিখ্যাত শহরে। (৭) ভারতের মধ্যমণি এই নদী হিন্দুদের কাছে খুবই পবিত্র। (৮) পঞ্চনদীর একটি।

(সমাধান আগামী সংখ্যায়)

গতবারের সমাধান

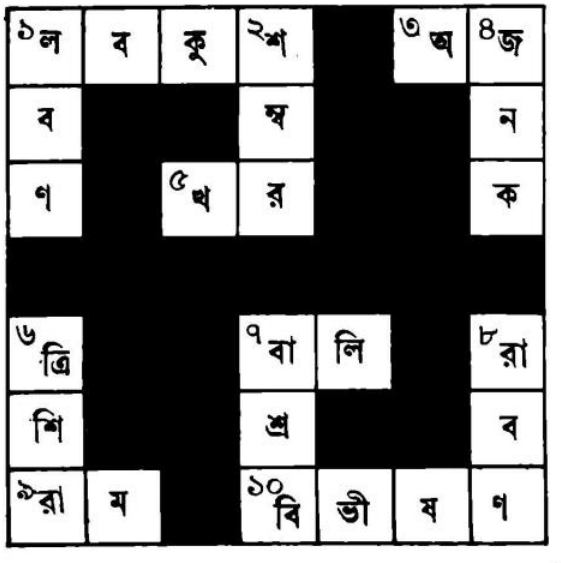

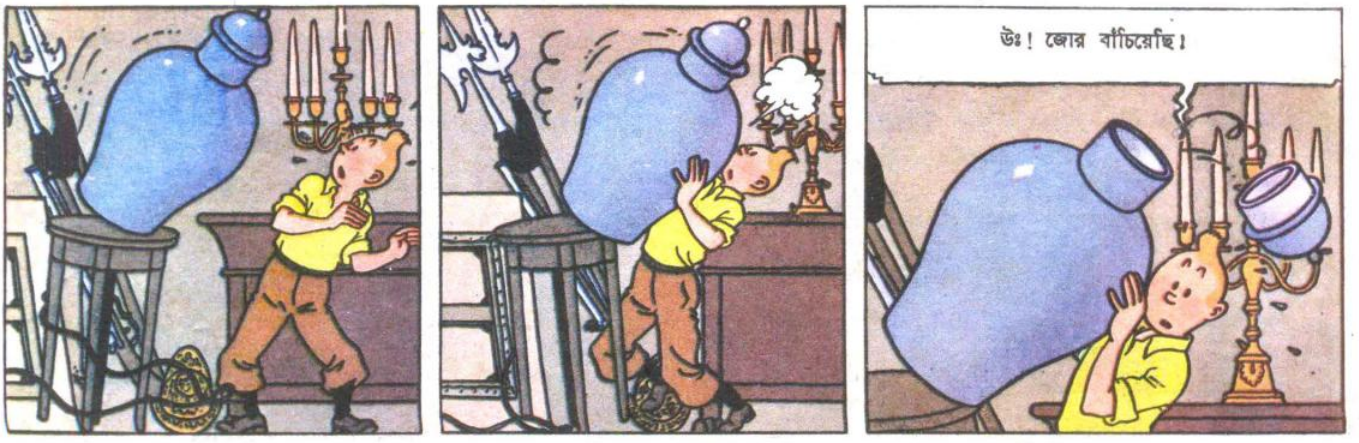
উঃ! জোর বাঁচিয়েছি।

বুম!
নিশ্চয় টিনটিন! এবারে ধরব।
কাছেই আছে!

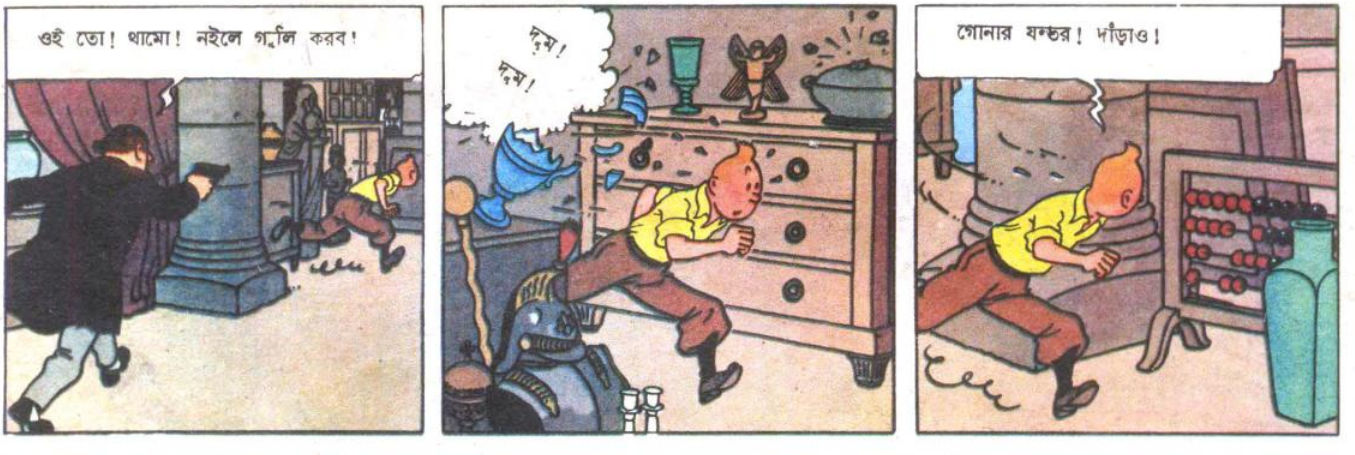
ওই তো! থামো! নইলে গুলি করব!
দুম!
দুম!
গোনার যন্তর! দাঁড়াও!

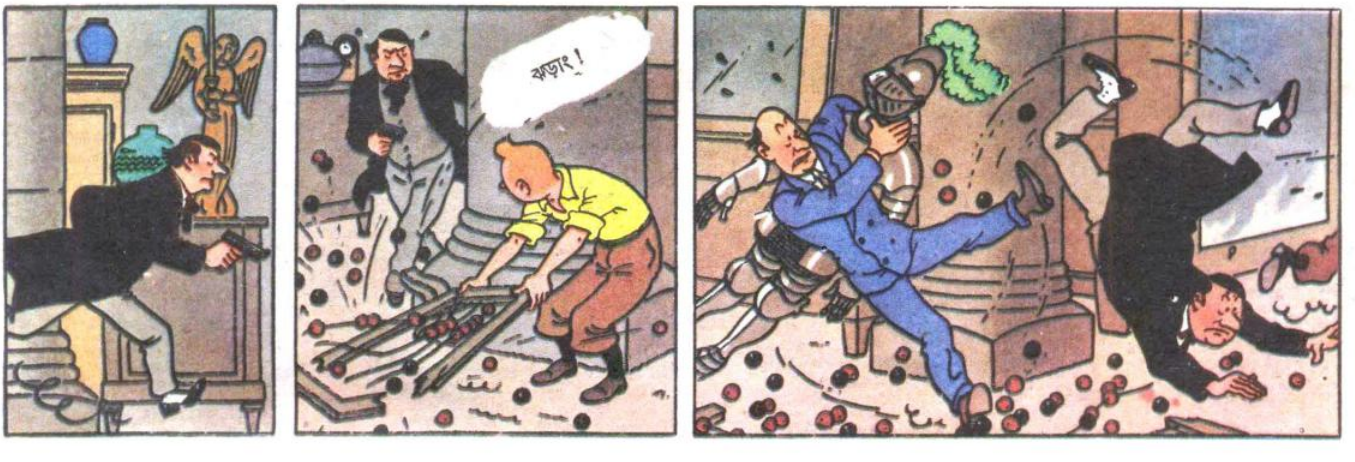
ঝড়াং!

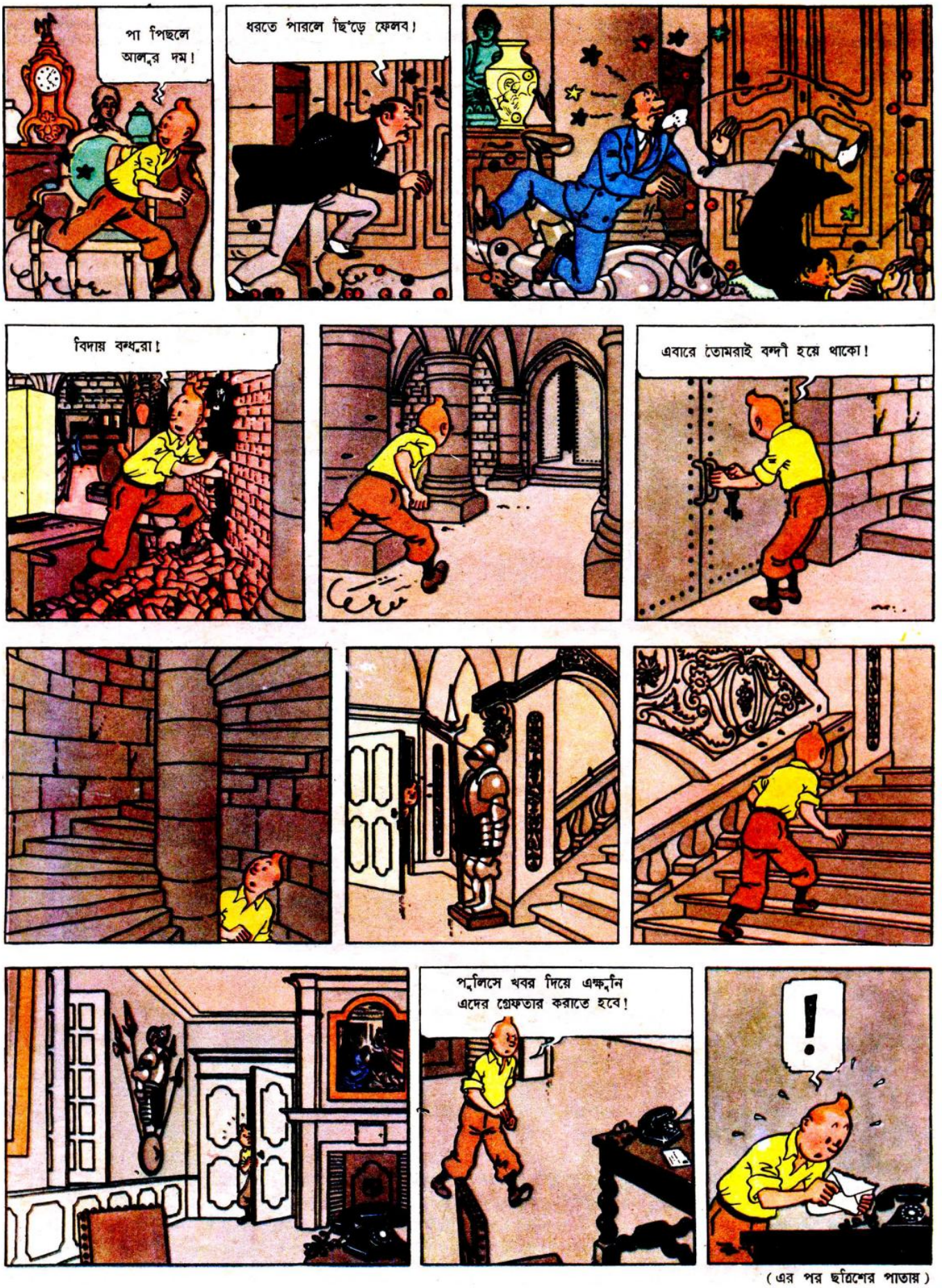

(এর পর ছত্রিশের পাতায়)

সেণ্ট মার্গারেটস স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন

কলকাতার শতায়ু স্কুলগুলির মধ্যে উত্তরে ডাফ স্ট্রীটের সেণ্ট মার্গারেটস স্কুল একটি পরিচিত নাম। স্কটল্যাণ্ড চার্চ মিশনের এক্তিয়ারভুক্ত এই স্কুলটিতে প্রায় প্রত্যেকবারই শতকরা একশ' জন পাশ করে। ১৯৬৫ সনে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় হিউম্যানিটিজে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান, ১৯৭৪-এ কমার্সে চতুর্থ স্থান এই স্কুলের দখলে আসে। আর ন্যাশনাল স্কলারশিপ তো প্রতি বছরই দু'একজন পেয়ে থাকে।

প্রধান-শিক্ষিকা শ্রীমতী সুকেশা হালদার। পারিবারিক জীবনের এক মর্মস্পর্শী দুর্ঘটনা তাঁকে শিক্ষাজগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে দিয়েছে। আজ সেণ্ট মার্গারেটস স্কুলই তাঁর স্বামী-পুত্র-কন্যা—সব কিছু। সাড়ে আটশোর মত ছাত্রী, চব্বিশজন শিক্ষিকা আর কিছু অশিক্ষক কর্মী নিয়ে তাঁর সুখী পরিবার। শ্রীমতী হালদার ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাই স্কুলে একটানা পঁচিশ বছর কাজ করে শ্রীমতী লাবণ্য মল্লিকের আহ্বানে ১৯৬৯ সালে এই স্কুলে যোগ দেন। তাঁর দাদা ডঃ মণ্ডল পাশেই স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

"ভাল ফল করতে গেলে কী রকম উত্তর লেখা দরকার?" সরাসরি এই প্রশ্ন করলাম। শ্রীমতী হালদার বললেন, "পরীক্ষার্থীকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, সে একজন শিল্পী। একজন শিল্পী যেরকম নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পসৃষ্টি করে, ঠিক সেইরকম নিষ্ঠার সঙ্গেই তার উত্তরকে সাজিয়ে তুলে দিতে হবে পরীক্ষকের হাতে। পয়েণ্টস্ সকলেরই উত্তরে কম-বেশি একই থাকে। কিন্তু সেই একই জিনিস কে কেমনভাবে সাজাচ্ছে, তার উপরই নম্বরের তারতম্য হয়। অবশ্য, আগে রচনাধর্মী উত্তরের ক্ষেত্রে এইরকম লেখার যতটা সুযোগ ছিল, এখনকার বস্তুমুখী ধরনের উত্তরে ঠিক ততখানি নেই। তবুও এর সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। আর-একটা কথা। ভাল ফল করতে হলে প্রশ্ন নির্বাচনে বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। সব সময় লক্ষ রাখতে হবে, কোন প্রশ্নে কম পরিশ্রমে বেশি নম্বর পাওয়া যায়।"

পয়েণ্টস্ সম্পর্কে শ্রীমতী হালদার আরও বললেন, "শুধু ভাল ছাত্রছাত্রী নয়—প্রত্যেকেরই উচিত একটা করে আলাদা পয়েণ্টস খাতা তৈরি করা। এতে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট উত্তরের পয়েণ্টস ভুলে যাবার সম্ভাবনা খুবই কমে যায়, অপর-দিকে তেমনি ওগুলিতে চোখ বুলিয়ে শেষ মুহূর্তে রিভিশনের কাজটিও সোজা হয়।

"যে ভাল ফল করতে চাইবে, তাকে অবশ্যই একাধিক বই পড়তে হবে—সব বিষয়েই। অনেক ক্ষেত্রেই স্কুলের বুকলিস্ট তৈরি হবার পর নমুনা বইগুলোর তেমন কোনও সদ্ব্যবহার হয় না। বইগুলো যাতে সকলে ব্যবহার করতে পারে, তার জন্যে সেগুলি ক্লাস-লাইব্রেরিতে রাখা উচিত।"

আমি বললাম, "আমাদের ছেলেমেয়েদের আসল সমস্যা তো ইংরেজী। ওতে আর কী বাইরের বই পড়বে?"

"ওকথা ঠিক নয়। একেবারে কাঁচা যারা, তাদের মূল সমস্যাটা অবশ্য ইংরেজী বাক্য-রচনা আয়ত্তে আনা। তাদের উচিত ছোট ছোট সহজ ও নির্ভুল বাক্য-রচনা অভ্যাস করা। বলা বাহুল্য, 'নির্ভুল' বলতে বানান ও ব্যাকরণগত দু'রকম ভুলকে এড়ানোর কথা বলছি। যে-কোনও উত্তর এ-রকম পাঁচটা বাক্য লিখেই আরম্ভ করুক না। পরে সে অভ্যাসের মাধ্যমে উন্নতি করবে। আর এই অভ্যাস হল লেখা, আরও লেখা। কিন্তু এইরকম ছেলেমেয়েরও উচিত তার সাধ্যের মধ্যে দু'একটা ভাল ইংরেজী গল্পের বই পড়া। গ্রামার-ভিত্তিক নাটিকা করে ইংরেজীতে কাঁচা ছেলেমেয়েদের গ্রামারে আকর্ষণ আনা যায়।"

"আর ভালরা?"

"তাদের লক্ষ্য তো যত পারা যায় বেশি নম্বর সংগ্রহ করা। কিন্তু গোড়ার কথা একই। সাধারণই হোক আর মেধাবীই হোক টেক্সট বইটা তাকে বারবার ভাল করে পড়তে হচ্ছে। বাইরের বই সে স্বাভাবিকভাবেই বেশি সংখ্যায় পড়তে পারছে। গ্রামার ট্রান্সলেশন ইত্যাদি টেস্ট পেপার্স থেকে নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে ইংরেজীর মাধ্যমে কথোপকথন করারও। উপরে দু'তিনটি ক্লাসে ইংরেজীটা সম্পূর্ণ ইংরেজী মিডিয়ামেই পড়ানো উচিত।"

বাংলা-সম্পর্কে শ্রীমতী হালদারের মূল বক্তব্য একই। "ভাল ফল করতে গেলে ভাষার উপর যথেষ্ট দখল থাকা চাই। ব্যাকরণ ও রচনা লেখায় বেশি জোর দিতে হবে—কারণ ব্যাকরণে অল্পায়াসে প্রচুর নম্বর পাওয়া যায়। আর, রচনা লেখাটাই তো মৌলিকত্ব দেখানোর শ্রেষ্ঠ জায়গা।

"ভূগোলেও একাধিক বাইরের বই পড়তে হবে। ম্যাপ

সম্পর্কে অনীহা ত্যাগ করতে হবে। ওর মত বড় বন্ধু ভূগোলে আর নেই। চার্ট, মডেল এগুলি কম নয়। মনে রাখতে হবে, অঙ্কনই ভূগোলের এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়গুলির ভাষা। কাজেই উত্তরে যেখানে সম্ভব ম্যাপ ও স্কেচ দেওয়া দরকার। ভূগোল সঠিকভাবে পড়তে গেলে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কেও রেডিও, সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে খোঁজখবর রাখা দরকার।"

"যেমন?"

"যেমন, তেল সম্পর্কে পড়তে গেলে পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতি বোঝা দরকার নয় কি? বেশি নম্বর পেতে গেলে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিকে বড়-বড় হরফে লেখা উচিত। ওতে পরীক্ষক বুঝতে পারবেন পরীক্ষার্থী ঠিক জায়গাতেই জোর দিয়েছে।"

"হাতের লেখায় হরফ বড় করা কি সম্ভব?" আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী হালদার বললেন, "মোটা রং-পেন্সিলে একবার বুলিয়ে দেবে আর কি।"

ইতিহাসে কী করতে হবে? "ইতিহাসে তো মোটামুটি জানা প্রশ্নই আসে। এখানেই বাইরের বই পড়তে হয় বোধহয় সবচেয়ে বেশি। ম্যাপ এবং টাইমচার্ট সব সময়েই ব্যবহার করতে হবে।"

বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সম্পর্কে সেন্ট মার্গারেটসের প্রধানা শিক্ষিকার অভিমত—ল্যাবরেটরি ব্যবহার করতে হবে। মডেল, চার্ট—এসব তো আছেই। উত্তরের সঙ্গে পরিষ্কার স্কেচ দেওয়া দরকার। অঙ্ক সম্পর্কে বললেন, "প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মূল নিয়মটিকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। টেক্সট পেপার্স এবং অন্যান্য বাইরের বই ব্যবহার করা দরকার। জ্যামিতিতেও চার্ট ব্যবহার করতে পারলে মৌল জিনিসগুলি মনে থাকে।"

আনন্দমেলার 'লেখাপড়া' বিভাগ সম্পর্কে শ্রীমতী হালদার বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করলেন। বললেন, এটি শিক্ষক ও ছাত্রদের আত্মসমীক্ষার মস্ত সুযোগ এনে দিচ্ছে।

কীভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল শম্পা মল্লিক খুব মন দিয়েই পড়াশোনা করছে। প্রত্যেক দিনই সকাল-সন্ধে মিলিয়ে ঘণ্টা ছয়েক পড়া চাই ওর। শম্পা অকপটে স্বীকার করল যে, ও একজন গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়। এবং নোট-বইয়েরও। শুধু তাই নয়। প্রয়োজনমত একাধিক নোট-বইও ব্যবহার করে। দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, বিভিন্ন নোট ও সাহায্যকারী বই থেকে ও যথেষ্ট উপকার পাচ্ছে।

বিবেকানন্দ রোডের মেয়ে শম্পা গোড়া থেকেই সেন্ট মার্গারেটসে পড়ছে। সেভেনে ফার্স্ট হওয়ার পর কেউ ওকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। সেভেনের আগেও অবশ্য থাকত প্রথম চার-পাঁচ জনের মধ্যে।

"তোমার প্রস্তুতির ধরনটা কী রকম?"

"প্রথমে স্কুলের পাঠ্য বইটা মন দিয়ে পড়ি। তারপর বাইরের যে-সব বই আমার আছে এবং যা পড়া দরকার, সেগুলো। যা পড়লাম তার থেকে কী ধাঁচের প্রশ্ন আসে তা দেখি—এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করে টেস্ট-পেপার্স ও নোট-বই। প্রশ্নগুলির উত্তর বিভিন্ন বইয়ের সাহায্যে লিখে নিজের মত করে তৈরি করে ফেলি। স্কুলে দিদিরা যে-সব নোট দেন, সেগুলিরও সাহায্য নিই। উত্তরগুলো গৃহশিক্ষক বা দিদিমণিদের কাছে দেখিয়ে নিতে হয়।"

ইংরেজীই হোক আর বাংলাই হোক, শম্পার পড়ার রীতি এইটাই। টেক্সট ভাল করে পড়ে শক্ত শব্দগুলির অর্থ আয়ত্ত করে। বলা বাহুল্য, ও ক্লাসের পড়া মন দিয়ে শোনে। ক্লাসে যা পড়ানো হবে, সেটা আগেভাগেই পড়ে আসে শম্পা। বলল, এতে অনেক সুবিধা হয়। ইংরেজীতে ও গ্রামার ও ট্রান্সলেশানের উপর খুব জোর দেয়। বাংলায় পি আচার্য'র রচনাবই পড়ে এবং বইয়ের সংকেত অনুযায়ী নিজে রচনা লেখে।

বহু স্কুলের দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র বা ছাত্রীর প্রিয় বিষয় জীবন-বিজ্ঞান সম্পর্কে শম্পার সেরকম কিছু আকর্ষণ নেই। কারণ ওর ভাল লাগে অঙ্ক। দারুণ। অনুশীলনীর একটা অঙ্কও বাদ দেয় না। স্কুলের বই কেশব নাগ আর নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। শম্পা এর উপর ঘোষ-চক্রবর্তীর উচ্চ-মাধ্যমিকের বইটা ব্যবহার করে। অবশ্য জীবন-বিজ্ঞানকে অবহেলা করে না। বুকলিস্টের বই (হরিদাস গুপ্ত) ছাড়াও কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু পড়ে। আর 'টেন স্কলার্স'-এর প্রশ্নোত্তরের বই। ভৌত-বিজ্ঞানে স্কুলে সুখেন্দু মাইতির বই পড়ানো হয়, এ ছাড়াও চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, অ্যাবট এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই পড়ে। এখানেও 'টেন স্কলার্স' পড়ে। আমি আরও কয়েকটা ভাল বইয়ের উল্লেখ করায় ও সেগুলির নাম সাগ্রহে লিখে নিল।

"ভূগোলে কী কী বই পড়ো?"

"ভূগোলে বড়দি' (শ্রীমতী হালদার) ডাডলি স্ট্যাম্প, স্টেম্ব্রিজ ইত্যাদি বিখ্যাত বই থেকে আমাদের অনেক কিছু লিখিয়ে দেন। ক্লাসে পড়ানো হয় পীযূষকান্তি সাহার বই। এ ছাড়া শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়ি। 'মানচিত্রে ভূগোল অনুশীলনী' আর শৈলেন সাহা ও বিজয় সাহার 'ভূপরিচয়'ও খুব ব্যবহার করি।"

একই ভাবে ইতিহাসে পাঠ্য প্রভাতাংশু মাইতির বই ছাড়াও শম্পা কিরণ চৌধুরীর উচ্চ-মাধ্যমিকের বই এবং ডঃ নিমাইসাধন বসুর বইয়েরও প্রয়োজনীয় অংশ পড়ছে। সংস্কৃতে বহুপরিচিত "হেল্পস টু দি স্টাডি", ব্যাকরণ কৌমুদী আর নবকলেবরে ব্যাকরণকৌমুদী। টেস্ট পেপার্স থেকে সংস্কৃত গ্রামার ও অনুবাদ অনুশীলন করে। কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার বিষয়টির সাহায্যে বেশি নম্বর তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও ও সচেতন।

শম্পার "এঞ্জিনীয়ারিং লাইনটা ভাল লাগে কিন্তু পড়াশোনা করার ইচ্ছা সরাসরি সায়েন্স নিয়ে।" অবসর সময়ে গল্প উপন্যাস মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি পড়ে। শংকরের কোনও বই ও বাদ দেয় না। মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে আনন্দমেলা তো আছেই। 'লেখাপড়া' বিভাগ সম্পর্কে ওর মন্তব্য, "এতে আমাদের সকলেরই খুব উপকার হয়।"

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ছবি/তপন দাশ

(তেত্রিশের পাতার পর)

গুলিবিদ্ধ হয়ে লোকটা কেন পাখি দেখিয়েছিল, এবারে বুঝতে পারছি। আসলে তার আততায়ীর নাম বার্ড....

এম অ্যান্ড জি বার্ড,
পুরাদ্রব্য ব্যবসায়ী,
মার্লিনস্পাইক হল,
মার্লিনশায়ার,
ইংল্যান্ড

এক্ষুনি ক্যাপ্টেনকে ফোন করা দরকার!

হ্যাঁ, আমি...কে? টিনটিন?... কোত্থেকে কথা বলছ?... হ্যাল্লো...হ্যাল্লো...

আমি হচ্ছি মিঃ বার্ডের নতুন সেক্রেটারি!

ও, তাই বুঝি? আমি জানতুম না সার্!

হ্যাল্লো নেস্টর!...নেস্টর! ...

বাড়িতে একটা গুণ্ডা ঢুকেছে! সে যেন টেলিফোন করতে না পারে! যেমন করে পারো, তাকে আটকাও! নেস্টর, শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাল্লো ক্যাপ্টেন! মার্লিনস্পাইক হল্ থেকে বলছি। এক্ষুনি পুলিস নিয়ে এখানে এসো! না, না, গ্রীস নয়, মার্লিনস্পাইক!

ফোন নামাও!

স্টার্লিংবাইট? হ্যাল্লো...হ্যাল্লো...

মার্লিনস্পাইক!

কী? মার্টিনবাইক? হ্যাল্লো...হ্যাল্লো....

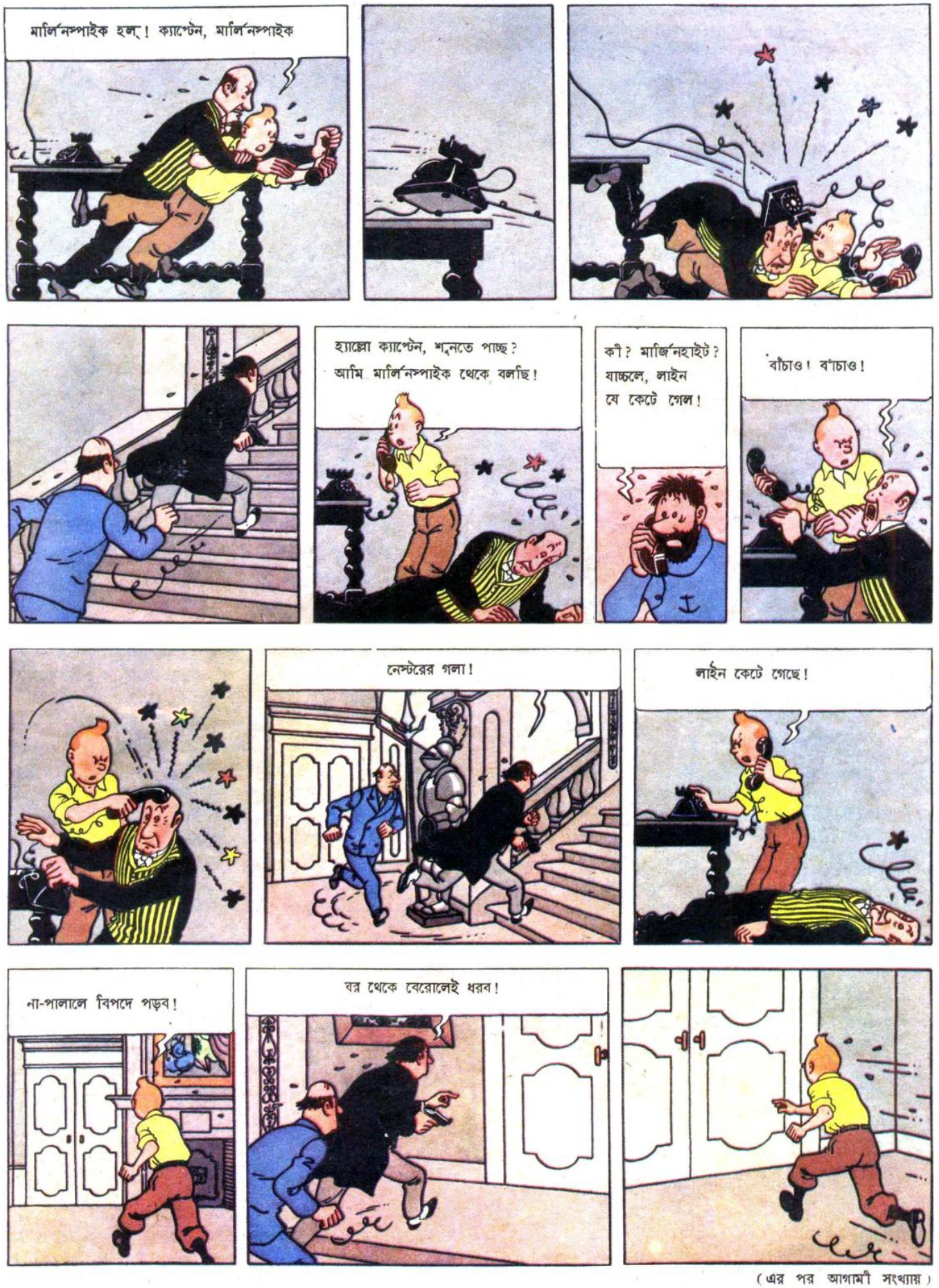

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

মনোজদের অদ্ভুত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে

মনোজদের বাড়িতে একটি অচেনা ছেলের ছবি আছে। ছবির ছেলেটাকে মনোজের খুব ভাল লাগে। ওদের বাড়িটা সত্যিই অদ্ভুত। গোয়েন্দা বরদাচরণ পাঁচিল টপকে ওদের বাড়িতে ঢোকার সময় কাকের ঠোক্কর খেয়ে উল্টে পড়লেন উঠোনে। তাঁর ছিটকে-পড়া পিস্তল লুকিয়ে পাচার হয়ে গেল পুতুলের পুতুল-খেলার বাক্সে। হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দনারায়ণের নিখোঁজ ছেলে কন্দর্পনারায়ণের ছবির সন্ধানে এসে হতাশ হলেন বরদাচরণ। রাজামশাই বলেছেন, যার কাছে রাজকুমারের ছবি পাওয়া যাবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তাই না শুনে মনোজের বাবা রাখোবাবু বাড়ির সবাইকে ডেকে বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছবিটা খুঁজে বার করতে হবে। পুতুলের বাক্স থেকে পিস্তলটা মনোজের কাকা ভজবাবুর হাতে এল। ভজবাবুর হাতে পিস্তল দেখে গোয়ালা হরশঙ্কর ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভজবাবু পিস্তলের শক্তি-পরীক্ষা করতে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়। এদিকে, মনোজদের বাড়িতে সবাই কুমার কন্দর্পনারায়ণের ছবি খুঁজে-খুঁজে হয়রান। ছবিটা কিন্তু মনোজের বইয়ের মধ্যে। ভজবাবু পিস্তল হাতে অপমানের শোধ তুলতে গিয়ে হেড স্যার গোলোকবিহারী চক্রবর্তীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে খেপে গেলেন। তারপর একজন পুলিশ কনস্টেবল, তাস-খেলুড়ে, সুদখোর গোবিন্দ আর বোহিসেবী শার্দুলকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে ডাকাতের একটা দলের ওপর পিস্তল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ডাকাতের দলে ঝানাই মাছওলা ছিল। কানাইকে ওঠবোস করাতে যাবার সময় তিনি ধরা পড়ে গেলেন মেজ সর্দারের হাতে। সর্দার বলল, একে আজ মা কালীর সামনে বলি দেওয়া হবে। কিন্তু, ঘটনাচক্রে ভজবাবু সে রাত্তের মতো ডাকাতদের সর্দার হয়ে গেলেন। ডাকাতি হবে রাজ-বাড়িতে। ওদিকে, দারোগা নিশিকান্ত এক দল সেপাই নিয়ে 'মার্ডারার' ভজবাবুকে ধরার জন্যে মনোজদের বাড়ি গিয়ে হাজির। কিন্তু, আদ্যাসুন্দরী দেবী কিছুতেই জুতো পরে সেপাইদের ঘরে ঢুকতে দেবেন না। বাধ্য হয়ে সেপাইরা দেয়াল টপকে ভেতরের উঠোনে নেমে পড়ল। একটু পরেই বৈজ্ঞানিক হারাধনের 'গোরিমান' অর্থাৎ অর্ধেক গোরিলা আর অর্ধেক হনুমান তাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। সেপাইরা পালিয়ে গেলে রাখোবাবু ভজবাবুকে খুঁজে বার করার আদেশ দিলেন সবাইকে। তারপর—

১৩

শরবতের গুণে ভজবাবুর ভারী ফুর্তি এসে গেছে। এত ভাল লাগছে তাঁর যে বলার নয়। মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠছেন।

রাত বারোটা বেজে গেল। ভরপেট মাংস আর ভাত খেয়ে ডাকাতরা খানিক গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়েছে। পুরুতমশাই সকলের কপালে তেল সিঁদুর আর যজ্ঞের কালি লাগিয়ে দিয়েছেন। কানে জবা ফুল গোঁজা।

ভজবাবু মন্দিরের চাতালে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে হাতে খাঁড়া নিয়ে রক্তচোখে সব দেখছিলেন। একটা হাঁক দিয়ে বললেন—সব লাইন করে দাঁড়া।

ডাকাতরা চটপট দাঁড়িয়ে গেল। সুন্দরমতো মেজ-সর্দার ভজবাবুর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে চেয়ে ভজবাবু এক গাল হেসে বললেন, "দেখলে! সবাই কেমন আমাকে মানে!"

"আপনার কথা আলাদা।"

"হে হে" বলে ভজবাবু নিজের হাতের খাঁড়াটা আবার বাঁই বাঁই করে চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ডাকাতদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "ভাইসব, আজ বড় আনন্দের দিন। আমি কথা বলতে পারছি না। আজ আমার কথাগুলি সব আনন্দের চোটে গান হয়ে যেতে চাইছে। তা ভালই। আমি গানে গানেই তোমাদের আদেশ করব। তোমরা সেইমতো চলবে। কেমন?"

ডাকাতরা একবাক্যে বলে ওঠে, "সর্দারের যেমন হুকুম।"

ভজবাবু গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে গেয়ে উঠলেন, "হে দস্যুবর্গ, হাতে নাও খড়্গ, চলো যাই লুণ্ঠনকর্মে..."

ডাকাতরা সবাই ঝটপট খাঁড়া, তলোয়ার, লাঠি আর বল্লম যে যা পারল হাতে নিয়ে দাঁড়াল।

ভজবাবু এবার অন্য গান ধরলেন, "চল্ রে চল্, বন্ধুদল, সামনে চল্ সবাই..."

ডাকাতরা চলতে থাকে। সবার সামনে ভজবাবু আর মেজো সর্দার। মেজো সর্দারের হাতে একটা মশাল জ্বলছে।

ভজবাবু খাঁড়া ঘুরিয়ে গাইতে লাগলেন, "বিঘ্ন বন্ধ, খানা ও খন্দ ডিঙিয়ে চল্ সবাই..."

*

ভজবাবুকে খুঁজতে বেরিয়ে বাড়ির লোকজন শহরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সরোজের হাতে একটা হকি স্টিক আর মনোজের হাতে একটা ক্রিকেটের স্টাম্প। দুজনে শহরের উত্তর ধারে চলে এসেছিল। জায়গাটা আগাছা আর জঙ্গলে ভরা। রাত নিশুত। এ অঞ্চলে লোকজনের বসবাস খুবই কম। শোনা যায়, এ অঞ্চলের বাসিন্দারা খুব একটা ভাল লোক নয়। দিনের বেলাতেও ভয়ে লোক এদিকে আসে না।

মনোজ হঠাৎ সরোজের হাত টেনে ধরে বলে, "এই দাদা!"

সরোজ থমকে গিয়ে বলে, "কী?"

"গান শুনছিস?"

সরোজ কান পেতে শোনে। ঝিঁঝিঁর ডাক, গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ আর ঘুম ভাঙা পাখির অস্পষ্ট ডাক, মাঝে মাঝে শেয়ালের "হুয়া, হুয়া"। এইসব ভেদ করে অনেক দূর থেকে ক্ষীণ একটা গানের শব্দ আসছে বটে। কে যেন গাইছে, "ভাঙব লোহার কপাট ভাই, আর তো কোনও শঙ্কা নাই..."

সরোজ বলল, "এ দিকেই আসছে!"

মনোজ খানিকটা গান শুনে বলল, "মেজকাকার গলা।"

"যাঃ!"

"দেখিস। ঐ শোন আরো কাছে এসে গেছে। ঐ দ্যাখ মশালের আলো! দাদা, লুকিয়ে পড়।"

দুই ভাই তাড়াতাড়ি গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে চেয়ে রইল। তারপর যা দেখতে পেল তা প্রত্যয় হয় না। তারা দেখল, ভজবাবু গান গাইতে গাইতে বিশাল এক দল ডাকাত নিয়ে চলেছেন।

দলটা দুই ভাইয়ের একেবারে নাকের ডগা দিয়েই যাচ্ছিল।

সরোজ বলে, "মেজকাকার হাতে খাঁড়া।"

মনোজ বলে, "মেজকাকার চোখ চকচক করছে।"

সরোজ বলে, "মেজকাকার হল কী?"

মনোজ হঠাৎ মেজকাকার পাশে মশাল হাতে মেজ সর্দারকে দেখতে পেল। একটু চমকে উঠল সে। কিন্তু শব্দ করল না।

ডাকাতের দল তাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ভজবাবু তখন গাইছেন, "বুকের ভিতরে ঘোড়া ছুটে যায়, ওরে তোরা ছেড়ে দে ছেড়ে দে আজ আমারে..."

সরোজ একটু ভেবে চিন্তে বলে, "মনে হচ্ছে, ডাকাতরা মেজকাকাকে কোথাও ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাই ছেড়ে দেওয়ার জন্য গান গাইছে মেজকাকা।"

মনোজ মাথা নেড়ে বলে, "মেজকাকাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না, মেজকাকাই ডাকাতদের নিয়ে যাচ্ছে।"

সরোজ বলে, "কিন্তু মেজকাকার যে দারুণ চোর-ডাকাত আর ভূতের ভয়!"

একটু দূর থেকে ভজবাবুর গলার গান ভেসে আসছিল, "সামনে রাজার বাড়ি, চল্ যাই তাড়াতাড়ি, বিবাদ-বিসম্বাদ থামা রে..."

মনোজ সরোজের হাত চেপে ধরে বলল, "দাদা, ডাকাতদের নিয়ে মেজকাকা রাজবাড়ির দিকে যাচ্ছে। এক্ষুনি ছোট-কাকাকে খবরটা দেওয়া দরকার।"

সরোজ বিরক্ত হয়ে বলে, "অত ঝামেলায় কী হবে? চল্ তার চেয়ে মেজকাকাকেই গিয়ে ধরলেই তো হয়। বলব, শিগগির বাড়ি চলো, বাবা ডাকছে। বাবা ডাকছে শুনলেই সুড়সুড় করে চলে আসবে।"

মনোজ মাথা নেড়ে বলে, "দূর, তুই মেজকাকাকে ভাল করে দেখিসনি। দেখলি না, মেজকাকার চোখ কেমন চকচকে, মুখটা ফোলা ফোলা, হাতে খাঁড়া, গলায় গান! এ সেই মেজকাকাই নয়, দেখলে আমাদের চিনবেই না। আর ডাকাতরাই বা ছাড়বে কেন? চল, বাড়ি গিয়ে ছোটকাকাকে ডেকে আনি!"

দুই ভাই বাড়ির দিকে দৌড়তে থাকে।

বাড়ির ফটকেই ঠাকুরঝি। তাঁর সাদা থান তিনি মাল-কোঁচা মেরে পরেছেন, হাতে টর্চ, লাঠি, আর কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা হাত দা। ঠাকুরমা উঠোনের দরজায় চুপটি করে বসে চোখের জল মুছছেন। মা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে।

সরোজ আর মনোজ ফটকের দিকে গেল না। ছোটকাকা হারাধন বলেছিল, ভাল করে তৈরি হয়ে বেরোতে তার কিছু দেরি হবে। দুই ভাই তাই গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকে।

ঢুকতেই দেখে, হারাধন তৈরি হয়ে বেরোচ্ছে। একটা

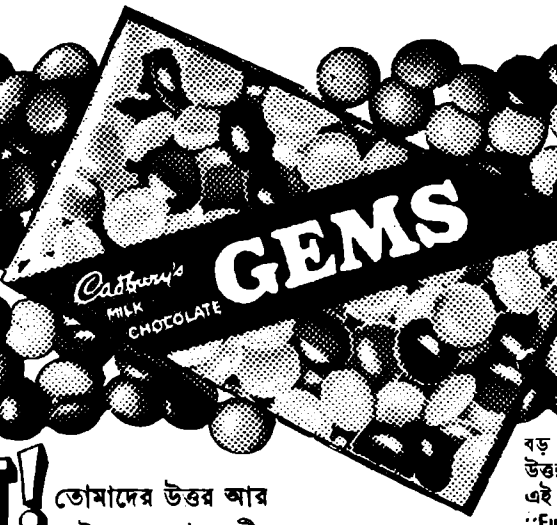

জেমসের মজার আসর
১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!
যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি?
16
37
28
49
41
62
58
Cadbury's MILK CHOCOLATE GEMS
শিগ্গীর! তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্ট চেক পাবে।
বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে।
এই ঠিকানায় পাঠাও:
"Fun with Gems" Dept C-34
Post Box No. 56, Thane-400 601
উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
৩০শে জুন, ১৯৭৭
রঙ বেরঙের, চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস
CHAITRA-C-69 BEN

গোরিমানকে শিকলে বেঁধে নিয়েছে হারাধন, অন্য হাতে একটা টস্তল (টর্চ+পিস্তল, এটা হারাধনের নিজের আবিষ্কার. একই সঙ্গে টর্চ এবং পিস্তলের কাজ করে), আর তার কাঁধে সেই বদমাশ কাকটা বসে আছে। পাখির ঘরে পাখিগুলো খুব চেঁচাচ্ছে।

মনোজ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, "ছোটকাকা. মেজকাকা ডাকাতের দল নিয়ে রাজবাড়ি লুট করতে যাচ্ছে। শিগগির চলো।"

হারাধন আকাশ থেকে পড়ে বলে, "মেজদা! ডাকাতের দল নিয়ে! রাজবাড়ি! আর কী বললি?"

সরোজ, "লুট করতে....."

মনোজ, "যাচ্ছে....."

হারাধন চোখ বুজে দাঁড়িয়ে বলল, "আবার বল। এবার একটু আস্তে আস্তে।"

সরোজ আর মনোজ পালা করে বলল। পাখির ঘরে পাখিরা খুব চেঁচাচ্ছে এখনো। হারাধন পিছনে ফিরে ঘরটা দেখে নিয়ে বলল, "পাখিগুলোর আজ হল কী? যাকগে। হ্যাঁ, রাজবাড়ি! রাজবাড়িই বললি তো!"

সরোজ আর মনোজ একসঙ্গে—"হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজবাড়ি।"

"মেজদা?"

সরোজ আর মনোজ—"মেজকাকা। গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে।"

"রাজবাড়ি!" বলে হারাধন তবু ইতস্তত করে।

ঠিক এ সময়ে হারাধনের পিছন থেকে কে যেন বিরক্তির গলায় বলে ওঠে, "হ্যাঁ মশাই, রাজবাড়ি। রাজার বাড়ি, যাকে বলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। জলের মতো সোজা।"

সবাই অবাক হয়ে দেখে, শালিখের খাঁচার পিছন থেকে দুঃখবাবু বেরিয়ে আসছেন।

হারাধন বলে, "আপনি এখানে?"

দুঃখবাবু দুঃখের সঙ্গে বলেন, "আর কোথায় লুকোব বলুন, কিন্তু এই বদমাশ পাখিগুলোই কি লুকিয়ে থাকতে দেয়! তখন থেকে চেঁচাচ্ছে।"

"লুকিয়ে ছিলেন কেন?"

দুঃখবাবু রেগে গিয়ে বলেন, "লুকোব না? একে তো খুনী, তার ওপর পুলিস, তিন নম্বর হনুমান, চার নম্বর এই রাতে ভজবাবুকে খুঁজতে যাওয়া। চাকরি করতে এসে তো আর প্রাণটা দিতে পারি না মশাই।"

হারাধন বলল, "কিন্তু পাখিগুলো এখনো চেঁচাচ্ছে কেন?"

"গণেশবাবুও আছেন যে!"

বলতে না বলতে টিয়ার খাঁচার পেছন থেকে গণেশবাবু বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, "গান গাইলেই হল কি না! সবাই যদি গান গাইতে পারত তবেই হয়েছিল আর কি!"

হারাধন অবাক হয়ে বলে, "হঠাৎ গানের কথা কেন?"

গণেশবাবু বললেন, "ঐ তো শুনলেন সরোজ আর মনোজের মুখে, ভজবাবু নাকি গান গাইতে গাইতে ডাকাতি করতে যাচ্ছেন। ডাকাতি করা খারাপ কাজ বটে, কিন্তু যে গানের গ জানে না তার গান গাওয়া ডাকাতির চেয়েও খারাপ কাজ।"

হারাধন বলে. "তা বটে, কিন্তু মেজদা তো কখনো ভুলেও গান গায় না।"

গণেশবাবু গায়ের ধুলো-টুলো ঝেড়ে বললেন, "আপনার এই চিড়িয়াখানাটা বড় জবর জায়গা মশাই। যে ঘরেই লুকোতে যাই সে ঘরেই ডিসটার্বেন্স। এ ঘরে গেলে হনুমান দাঁত খিঁচোয়, ও ঘরে সাপ ফোঁস ফোঁস করে, সে ঘরে ব্যাং ডাকে, এ ঘরটায় পাখিদের কী কিচির মিচির বাবা! এর চেয়ে ভজবাবুর গান শোনা ভাল। চলো দেখি সরোজ মনোজ, তোমাদের মেজকাকু কেমন গাইছে সেটা শুনে আসি।"

দুঃখবাবু মনের দুঃখে বলে, "সবাই গেলে আমিই বা একা থাকি কী করে? এ বাড়ি খুব সেফ নয়। চলুন আমিও না হয় একটু ঘুরে আসি।"

*

রাত্রিবেলা রাজা গোবিন্দনারায়ণের ভাল ঘুম হয় না। তার কারণ হল, শোওয়ার আগে তিনি কোমরে একটা মোটা ঘুনসিতে রাজবাড়ির যত চাবি আছে সব বেঁধে নিয়ে তবে ঘুমোতে যান। রাজবাড়ির চাবির সংখ্যা কম নয়। দেউড়ির চাবি থেকে শুরু করে ভাঁড়ারের চাবি মিলিয়ে ছোট বড় শত খানেক তো হবেই। কোমরের চারধারে গোল, মোটা, লম্বা, ছোট বড় হরেক চাবি ঝুলিয়ে রাজা যখন শোন তখন সেগুলো গায়ে ফোটে। তার ওপর একটু নড়লে চড়লেই

চাবিগুলোর ঝন্ ঝন্ করে বিকট শব্দ হয়।

গোবিন্দনারায়ণের আজ রাতে ঘুম না হওয়ার একটা তৃতীয় কারণও আছে। গোয়েন্দা বরদাচরণের কাছ থেকে তিনি আজই জানতে পেরেছেন যে, চোরকুঠুরির জমানো টাকাগুলো সবই অচল। তাঁর অবশ্য বিশ্বাস হয়নি। তাই সন্ধের পর তিনি চোরকুঠুরি থেকে দুটো টাকা বের করে চাকরকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন মুড়ি কিনে আনতে। চাকর এসে টাকা দুটো ফেরত দিয়ে বলেছে, "দোকানদার জিজ্ঞেস করল এ নোট দুটোয় কি উটের ছবি ছাপা আছে?"

গোবিন্দনারায়ণ তখন থেকে শোকমগ্ন। তার ওপর হাড় হাভাতে গোয়েন্দাটা মহা জ্বালাতন শুরু করেছে তখন থেকে। কেবল বলছে, "আপনি আমার মাস মাইনেটা কি ঐসব টাকা দিয়ে দেবেন নাকি? আপনার মতলব তো ভাল ঠেকছে না রাজামশাই!"

গোবিন্দনারায়ণ তাকে যতই ধমকান সে কিছুতেই শোনে না। কেবল বলে, "ও হোঃ হোঃ, আমি যে অনেক আশা করে কেসটা হাতে নিয়েছিলাম!"

তর্কে বিতর্কে রাত হয়ে যাওয়ায় বরদাচরণ আর বাড়ি ফেরেননি, তিনি রাজা গোবিন্দনারায়ণকে বলেছেন "সকাল হলে আমি রাজবাড়ির রুপোর বাসন নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে দেব।" এই বলে গোয়েন্দাটা রাজার হেঁসেলে রাতের খাওয়া সেরে বাইরের দরবার ঘরে ঘুমোতে গেছে।

সেই থেকে গোবিন্দনারায়ণের ঘুম নেই। চোর কুঠুরির সব টাকা অচল। গোয়েন্দা সকালবেলা রুপোর বাসন নিয়ে যাবে। ভাগ্নেটা গাওয়া ঘিয়ের লুচি খেয়ে গেল।

রাত বারোটার পর গোবিন্দনারায়ণ আর বিছানায় থাকতে পারলেন না। এই শীতেও বিছানাটা গরম ঠেকছে। উঠে চাবির শব্দ তুলে একটু পায়চারি করছিলেন। সে সময়ে শুনতে পেলেন কে যেন দেউড়ির কাছে গান গাইছে, "দরজা খোলো হে, ঝটপট খোলো, দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা..."

গান গোবিন্দনারায়ণের খারাপ লাগে না। তিনি তাই ভাল করে শোনার জন্য দোতলার অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। আর দাঁড়িয়েই মূর্ছিত হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

ভজবাবু উঁচু গলায় গাইলেন, "দরজা যদি না খোলো তবে আজ টেনে তুলে নেব চামড়া..."

রাজবাড়ির দুচারজন বুড়ো দারোয়ান এখনো অবশিষ্ট আছে। তারা সব ঘুমোচ্ছিল, গান শুনে উঠে সবাই বাইরে এসে ফটকের বাইরের দৃশ্য দেখে হাঁ।

মেজ সর্দার বাইরে থেকে গর্জন করে ওঠে, "এই! সব হাঁ করে দেখছিস কী? ফটক খুলে দে!"

একজন বুড়ো দারোয়ান চাবির জন্য রাজার কাছে দৌড়ে এল। রাজা মূর্ছা ভেঙে বললেন, "দুর্গা দুর্গতিনাশিনী! গোয়েন্দাটা বসে বসে মাইনে খায়, ওটাকে ঘুম থেকে তুলে দে তো! আর দৌড়ে পিছনের ফটক দিয়ে গিয়ে পুলিসে খবর দে।"

দারোয়ান চলে গেল।

বাইরে ভজবাবু গেয়ে উঠলেন, "লাথি মেরে ভাঙব তালা, দারোয়ান দৌড়ে পালা, বাঁচতে যদি চাস..."

মুহূর্তের মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশটা মশাল জ্বলে উঠল। সেই সঙ্গে রাজবাড়ির পুরনো মরচে পড়া ফটকে দমাদম লাথি পড়তে থাকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ফটক ভেঙে ডাকাতরা রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে থাকে।

*

দারোগাবাবু রাতে কিছু খাননি। দু চুমুক দুধ বার্লি খেয়ে শুয়ে মা কালীর নাম করছিলেন। একটা সেপাই তার গা হাত পা টিপে দিচ্ছিল।

সদ্য ঘুমটা এসেছে এমন সময় থানা থেকে লোক এসে খবর দিল, "রাজবাড়িতে ডাকাত পড়েছে। যেতে হবে।"

শুনে দারোগাবাবু দুঃস্বপ্ন মনে করে এক পাশ থেকে আর এক পাশ ফিরে শুলেন।

কিন্তু থানার লোকটা ছাড়ে না। কেবল ডাকাডাকি করে, "বড়বাবু, উঠুন, রাজবাড়িতে ডাকাত পড়েছে।"

ঘুম-চোখে দারোগাবাবু বললেন, "রাজবাড়ির ডাকাত তো! আমাদের বাড়ির তো নয়! আমাদের কী তাতে?"

"সব লুঠ হয়ে গেল বড়বাবু!"

দারোগাবাবু ফের পাশ ফিরে বললেন, "লুঠ করে যাবে কোথায়? কাল সকালেই সব কটাকে ধরে ফেলব।"

"খুন-খারাবি হবে যে!"

"খুন করতে বারণ করে দে। একটু ভয় দেখিয়ে দিবি। বলবি খুন করলে ফাঁসি হবে। লুঠ করলে জেল।"

লোকটা কাকুতিমিনতি করতে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে ঘুমের ঘোর ভেঙে দারোগাবাবু বলেন, "ওঃ বাবা! এক দিনে আর কত হবে। মার্ডারার, হনুমান, ডাকাত! ব্যাটারা পেয়েছে কী আমাকে! আমি কি ওদের চাকর যে যা খুশি করবে আর আমাকে দৌড়ে বেড়াতে হবে!"

কিন্তু কর্তব্যবশে দারোগাবাবুকে উঠতেই হল। পোশাক পরে মা কালীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, "মা গো!

আমি যাওয়ার আগেই যেন ডাকাতি করে ডাকাতরা সরে পড়ে। ধর পাকড়ের অনেক হাঙ্গামা যা!"

*

বরদাচরণের ঘুম কুকুরের ঘুমের মতো পাতলা। গোয়েন্দাদের এটাই গুণ। ফটক ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন তিনি। রাজবাড়ি থেকে তাঁকে শোওয়ার জন্য একটা মোটা কুটকুটে কম্বল দিয়েছে, তাই সারা গা চুলকোচ্ছিল।

বরদাচরণ গা চুলকোতে চুলকোতে বেরিয়ে এসেই ভজবাবুর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন। দেখলেন, ভজবাবুর হাতে খাঁড়া, কপালে তেল সিঁদুরের ছাপ, কানে জবাফুল, কণ্ঠে গান। ভজবাবু খাঁড়াটা ঘোরাতে ঘোরাতে গেয়ে ওঠেন, "ছুঁসনে আমাকে, দূরে দূরে থাক্, নইলে মাথাটা করব দুফাঁক, ওরে গোয়েন্দা পাজি..."

কিন্তু ভজবাবুকে ছোঁওয়ার ইচ্ছে বরদাচরণের একটুও নেই। ছুঁয়ে হবেটা কী? এত রাতে কারই বা চোর-পুলিস খেলতে ইচ্ছে যায়? তিনি বললেন, "ভজবাবু, এত রাতে কী ব্যাপার?"

পিছন থেকে ডাকাতরা রে-রে করে ওঠে।

বরদাচরণ পিস্তলের জন্য খাপে হাত দিলেন। পিস্তল নেই। আর পিস্তলহীন গোয়েন্দা যে কত অসহায় তা বুঝতে পেরে বরদাচরণ পিছু ফিরে দৌড় লাগালেন।

কিন্তু পারবেন কেন? দৌড়ে হয়ত পারতেন, কিন্তু প্রথমেই সিংহাসনে হোঁচট খেয়ে মেঝেয় পড়লেন। উঠে ছুটতে গিয়ে ফের দেয়ালে ধাক্কা লাগল।

ভজবাবু এসে দাঁড়িয়ে গাইতে থাকেন, "বলো আজ তুমি কোথায় পালাবে, যেখানেই যাও সেখানেই যাবে দস্যুরা তোর পিছনে..."

"হচ্ছে না! সুর হচ্ছে না।" অন্ধকারে কে যেন চেঁচিয়ে বলে ওঠে।

ভজবাবু রেগে গিয়ে বলেন, "কে বলে সুর হচ্ছে না?"

"আমি বলছি," বলে ডাকাতদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে গণেশবাবু ঘরে ঢুকে বলেন, "গানটা ইয়ার্কি নয় ভজবাবু! শিখতে হয়। ওটা কীরকম গান হল শুনি! সর্বেশ্বর কারফর্মার 'দস্যু' নৃত্যনাট্য আমি নিজে ডিরেকশন দিয়েছি কতবার। শুনবেন? তাহলে শুনুন! বলে গণেশবাবু হাত নেড়ে নেড়ে গাইলেন, "বলো আ...আজ তু...উমি কোথায় পা...আলাবে..."

ভজবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "কাজের সময় এখন দিক করবেন না তো গণেশবাবু! আমি এখন ডাকাতদের ডিরেকশন দিচ্ছি..."

"এঃ, ডিরেকশন যত খুশি দিন, তা বলে গানের অপমান আমি সহ্য করব না।"

এ নিয়ে একটা ঝগড়া বেধে উঠল বেশ।

মেজ সর্দার বা অন্য ডাকাতরা এসব ঝগড়া কাজিয়া দেখে ভ্রূক্ষেপ করল না। তারা কাজ হাঁসিল করতে এসেছে। ঝগড়া কাজিয়া নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে কেন?

মেজ সর্দার গিয়ে সোজা গোবিন্দনারায়ণের গলায় খাঁড়া ধরে বলল, "চাবিগুলো দিয়ে দিন রাজামশাই।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি/সুধীর মৈত্র

ম্যাজিক ! ম্যাজিক !

জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

এবারের ম্যাজিকটা খুব ছোট্ট, কিন্তু খুব মজার। এর জন্য বিশেষ-কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। দরকার শুধু একটু প্রস্তুতি এবং অভ্যাসের।

প্রথম থেকে শুরু করছি। টেবিলের ওপর একটা কাচের গ্লাস আর একটা দেশলাই রয়েছে। দেশলাইটা খুলে দেখান হল সেটা একদম খালি। জাদুকর এবার কয়েকটা পয়সা নিয়ে দর্শকদের দেখিয়ে বললেন, "এখানে কতগুলো দুই, তিন ও পাঁচ পয়সা এবং শুধু একটাই দশ পয়সা রয়েছে। এই সবকটাই আমি কাচের গ্লাসটায় ফেলে দিচ্ছি।" বলে তিনি গ্লাসের ভেতর সব কটা পয়সা ফেলে দিলেন। তারপর একটা সাদা রুমাল নিয়ে তিনি চারদিকে ঘুরিয়ে দেখালেন রুমালটায় কোথাও কিছু নেই; একেবারে সাধারণ রুমাল। এবং সেটাকে দিয়ে তিনি গ্লাসটা চাপা দিয়ে জাদুর ভঙ্গিমায় হাত নেড়ে, আস্তে আস্তে রুমালটা গ্লাসের ওপর থেকে তুলে নিলেন। কী আশ্চর্য! সব কটা পয়সাই ওখানে আছে, শুধু দশ পয়সাটাই গ্লাস থেকে উধাও হয়ে গেছে। এবার জাদুকর দেশলাই-বাক্সটা আস্তে আস্তে খুললেন। দেখা গেল দশ পয়সাটা দেশলাইয়ের ভেতর রয়েছে। সবাই তো অবাক্ — পয়সাটা গ্লাস থেকে দেশলাইয়ের বাক্সে গেল কী ভাবে? তোমরাও নিশ্চয়ই খুব অবাক্ হচ্ছ, ভাবছ, কী করে সম্ভব এটা!

শুনে খুব কঠিন মনে হলেও আসলে এটা খুব সহজ ম্যাজিক। পয়সাগুলোর সবকটাই সাধারণ, শুধু দশ পয়সাটার পেছন দিকে আঠা দিয়ে এক টুকরো সরু নাইলন সুতো আটকানো ছিল। অন্য পয়সাগুলোর

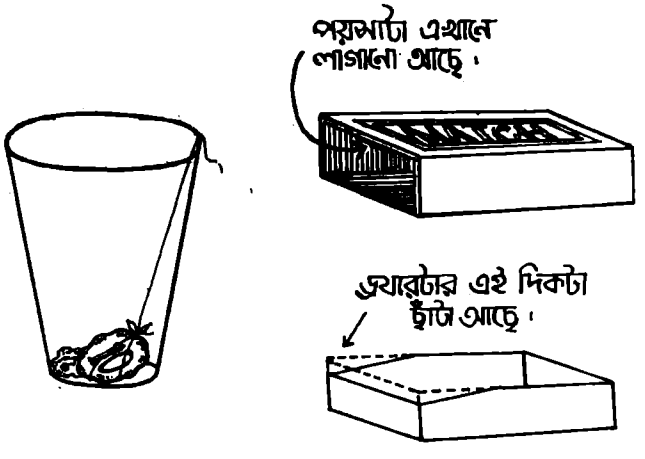

সঙ্গে সেই দশ পয়সাটাও যখন গ্লাসে ফেলে দেওয়া হল, তখন খেয়াল রাখতে হবে, ঐ নাইলনের সুতোটা যেন গ্লাসের বাইরে থাকে। যখন রুমালটা তোলা হবে, তখন সাবধানে সুতোটাকে ধরে টানলেই সেই দশ পয়সাটা বার হয়ে আসবে। পয়সাসুদ্ধ রুমালটাকে এবার সাবধানে পকেটে রেখে দাও। একটু অভ্যাস করে দেখালে দেখবে কেউই জানতে পারবেন না।

এই তো গেল দশ পয়সাটা অদৃশ্য করার কারসাজি। এবারে বলছি, দ্বিতীয় অংশটার কথা। অর্থাৎ পয়সাটা ঐ দেশলাইয়ের বাক্সে এল কী করে। বুঝতেই পারছ, দেশলাইটা আসলে মোটেই সাধারণ ছিল না। সেখানে আগের থেকেই একটা কায়দা করা ছিল। দেশলাইয়ের খাপের ভেতরের দিকে একটু নরম মোম দিয়ে দশ নয়া পয়সা লাগানো ছিল আর ড্রয়ারটার একটা ধার ছিল একটু কেটে সরু করে ছাঁটা। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। সরু দিকটা ঠেলে ঠেলে উল্টো দিকে অর্থাৎ ড্রয়ারের চওড়া দিকটা দিয়ে ড্রয়ারটা বার করলে ড্রয়ারটা খালিই দেখাবে। কিন্তু চওড়া দিকটা দিয়ে ভেতরে ঠেললে ড্রয়ারের চাপেই পয়সাটা খাপের থেকে খুলে ভেতরে পড়ে যাবে। অর্থাৎ প্রথমবারে খুলে দেখানো যাবে বাক্সটা খালি—আর দ্বিতীয়বারে খুললেই দেখা যাবে তাতে দশ নয়া চলে এসেছে। ঠিকমতো খেয়াল করে ঠেললে এটা ঠিক যন্ত্রের মতো কাজ করবে। দর্শকেরা তো আর এসব জানবেন না, তাঁরা ভাববেন ম্যাজিক করেই পয়সাটা বোধ হয় গ্লাস থেকে দেশলাইয়ের ভেতর চলে এসেছে। একটু অভ্যাস করে দেখালেই দেখবে সবাই কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা বলো তো

ভানুমতী

প্রঃ কার কান মলে দিলেও সে রাগ করে না?
উঃ তানপুরার কিম্বা সেতারের।

প্রঃ কোন গাছ গম্ভীর গলায় হাঁক পাড়ে?
উঃ গর্জন।

প্রঃ মানুষ কখন টুকরো টুকরো হয়?

উঃ আহ্লাদে আটখানা হলে।

প্রঃ ধুনুরীদের সঙ্গে রাগী স্যারেদের কোনখানে মিল?
উঃ দুজনেই পিটিয়ে তুলো ধোনা করেন।

প্রঃ কোন পাখি চরতে দেখলেই সর্বনাশ?
উঃ ঘুঘু, যদি ভিটেয় চরে।

প্রঃ তিনি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বর্ণমালার ভেতর ঢুকে গেলেন কেন?

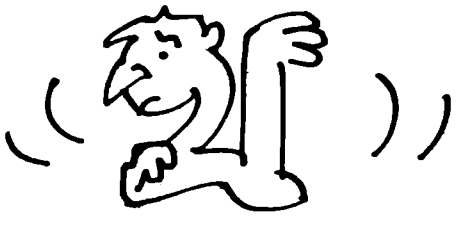

উঃ 'থ' হয়ে গেলেন কিনা।

প্রঃ মুলো গাছে কি হাত-পা তুলে ঝুলে থাকা সম্ভব?
উঃ সম্ভব, যদি সেটা হট্টমুলোর গাছ হয়।

প্রঃ কোন শাস্ত্র পড়ার নয়, শুধু দেখার?
উঃ দর্শন।

প্রঃ কোন কলা গাছে ফলে না?
উঃ চিত্রকলা, কিম্বা চাঁদের কলা।

প্রঃ কাকে চাঁটি না মারলে আওয়াজ বেরোয় না?
উঃ তবলাকে।

প্রঃ পাশের বাড়ির কাঁদুনে খোকাকে অলিম্পিকে পাঠালে সে ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় নির্ঘাত সবাইকে হারিয়ে দেবে। কেন বলো তো?
উঃ কারণ সে রোজই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে।

ছবি/অহিভূষণ মালিক

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

মণিমেলা শাখাকেন্দ্রগুলি বাংলা নতুন বছরকে সাদর আহ্বান জানিয়েছে প্রভাতফেরি, শারীর ক্রীড়া প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পয়লা বৈশাখ কিছু মিষ্টিমুখের আয়োজনও ছিল।

জনসাধারণের কাছ থেকে মণিমেলা পতাকা দিবসে প্রায় বারো হাজার টাকা পাওয়া গেছে। এ জন্য কেন্দ্রপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রাপ্ত সমুদয় অর্থই শিশুকল্যাণের কাজে ব্যয় করা হবে।

১৯৭৬-৭৭ সালে কেন্দ্রের পরীক্ষায় পদ্মরাগ মণিপ্রতীকে ২,১৫৫ জনের মধ্যে ১,৬২২ জন (৭৫%), মরকত মণিপ্রতীকে ৮৯০ জনের ভেতরে ৭৫৭ জন (৮৫%), নীলা মণিপ্রতীকে ২৯৫ জনের মধ্যে ১১৪ জন (৩৯%) এবং হীরক মণিপ্রতীকে ৪৩ জনের ভেতরে ৬ জন (১৪%) উত্তীর্ণ হয়েছে। কর্মীদের প্রাথমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ৪৫ জনের মধ্যে ৪০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এই পরীক্ষায় অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে পাশ করেছে ৩৫ জন এবং কমপক্ষে ৬০% নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশন পেয়েছে ৫ জন। কেউই অনার্স পায়নি। এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ঐকতান মণিমেলার শ্রীনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়। মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় মোট ৩০ জনের ভেতর ২৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এই পরীক্ষায় অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ১০ জন, অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশন পেয়েছে ১৭ জন এবং কমপক্ষে ৭৫% নম্বর লাভ করে অনার্স মানের কৃতিত্ব অর্জন করেছে ২ জন। এই পরীক্ষায় বেলুড়ের বাণীতীর্থ মণিমেলার শ্রীতরুণ চক্রবর্তী প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

কেন্দ্রমণি ১৯৭৭-৭৮ সালের জন্য মণিমেলাগুলিকে দেয় কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন। আলোচ্য বছরে নিয়মিত শাখাকেন্দ্রগুলিকে গ্রন্থাগারের বই ও খেলাধুলোর সরঞ্জাম কেনার জন্য কিঞ্চিদধিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মণিমেলার বহুমুখী শিশুকল্যাণ কার্যক্রম বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন শাখাকেন্দ্র গড়ে তুলতে স্থানীয় অভিভাবক ও শিশু-কল্যাণ কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে। কোনও অঞ্চলে নতুন মণিমেলা গড়তে হলে ডাকে অথবা সরাসরি মণিমেলা মহাকেন্দ্র, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক-২, রুম-৫, কলকাতা-৭০০০২৯ (ফোন : ৪৬-৯৮১০) এই ঠিকানায় রবিবার ও বৃহস্পতিবার বাদে যে কোনও দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে। মণিমেলা মহাকেন্দ্রের অনুমোদনপ্রাপ্ত নিয়মিত শাখাকেন্দ্র ছাড়া অন্য যে কোনও সংস্থার মণিমেলা নাম ব্যবহার করা বেআইনী।

আঞ্চলিক সংবাদ

কাঁচরাপাড়া অঞ্চলের মণিমেলাগুলি সম্প্রতি একদিনের এক শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল। এই অঞ্চলের কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু এবং মানসী মণিমেলা যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে।

তোমার দাদু ওই চশমা পরলেই
সব কিছু ঝিকঠাক দেখতে পান

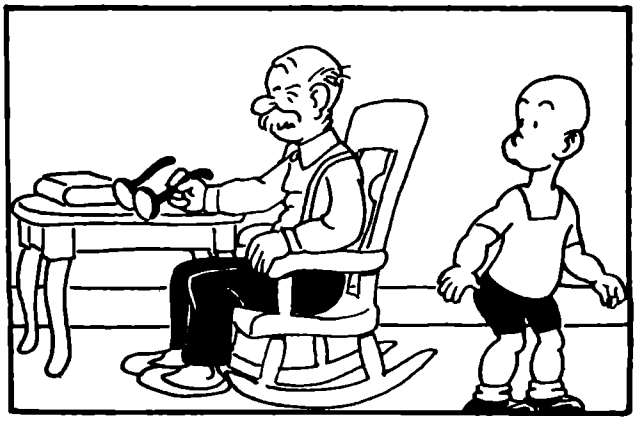

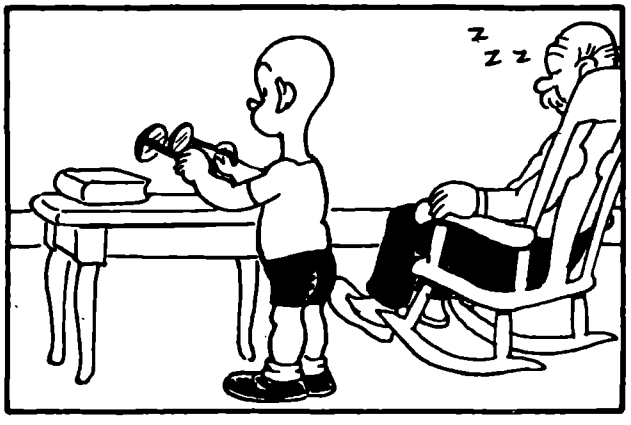
z z z

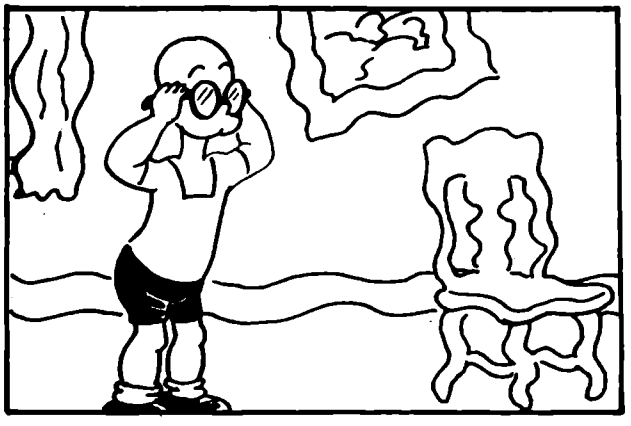

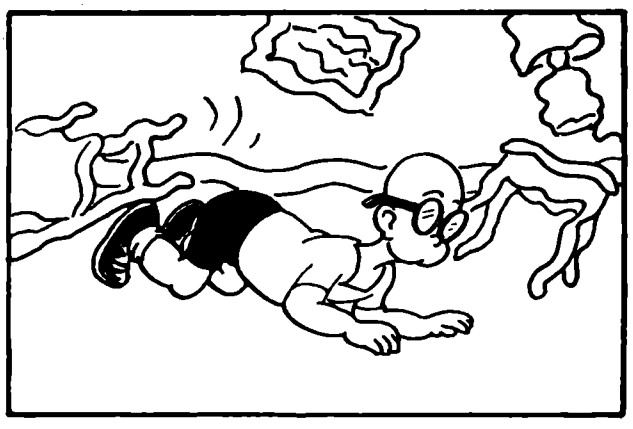

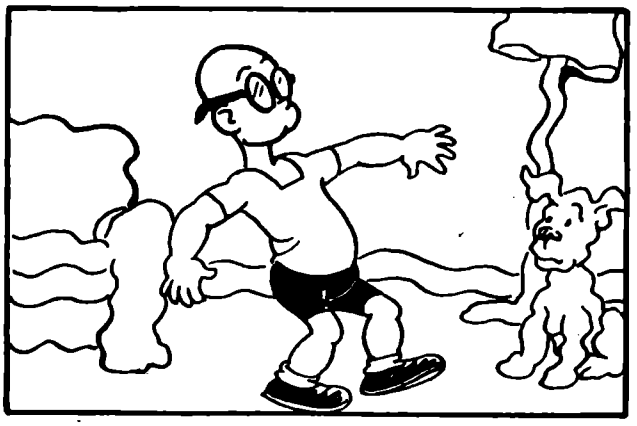

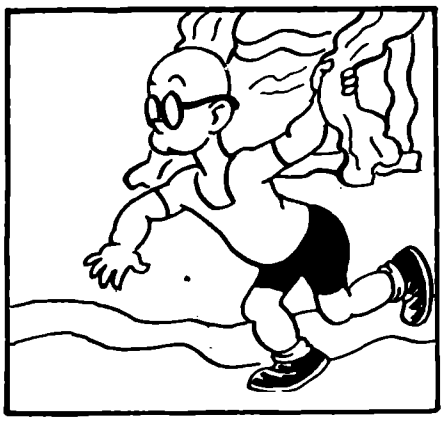

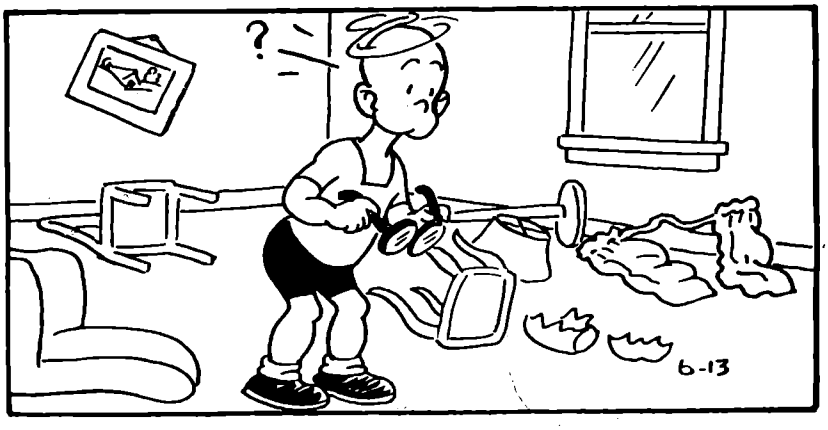
?
6-13

উল্টোরথ

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

উঁচু নিচু মাঠের পথ,
দাড়ি বাঁধা টিনের রথ,
তালপাতার ভেঁপু
ফুঁকছে টুনি টেঁপু।

রথের ঠাকুর জগন্নাথ,
রংটা কালো, নেইকো হাত,
জ্বলছে বাতি রথে—
ব্যাঙটা শুয়ে পথে।
ঠ্যাঙটা পাছে খোঁড়া হয়
ব্যাঙটা লাফায় পেয়ে ভয়।
ধাক্কা খেয়ে রথটা কাত,
উল্টোরথে জগন্নাথ!

দুটি ছড়া

এ সি সরকার (জাদুকর)

আনতে জ্বরের পথ্য খুকুর,
গেলেম চলে দত্তপুকুর।
আমায় নতুন মানুষ দেখে—
ঘেউ ঘেউ ঘেউ জোরসে ডেকে,
করল তাড়া মস্ত কুকুর!

॥ ২ ॥

স্কুল-বাড়িটার বাইরে পথে
বিষ্টু বেচে মিষ্টি কুল।
সেই কথাটা আসতে মনে,
বসে ক্লাসের একটি কোণে,
একটি পাতা ডিক্টেশনে—
কেষ্ট করে বিশটি ভুল!

সুলেখা কলার বক্সের রং দিয়ে ছবিটি রাঙিয়ে তোল

ল্যাংড়া আমের গল্প

রাধাগোবিন্দ মাইতি

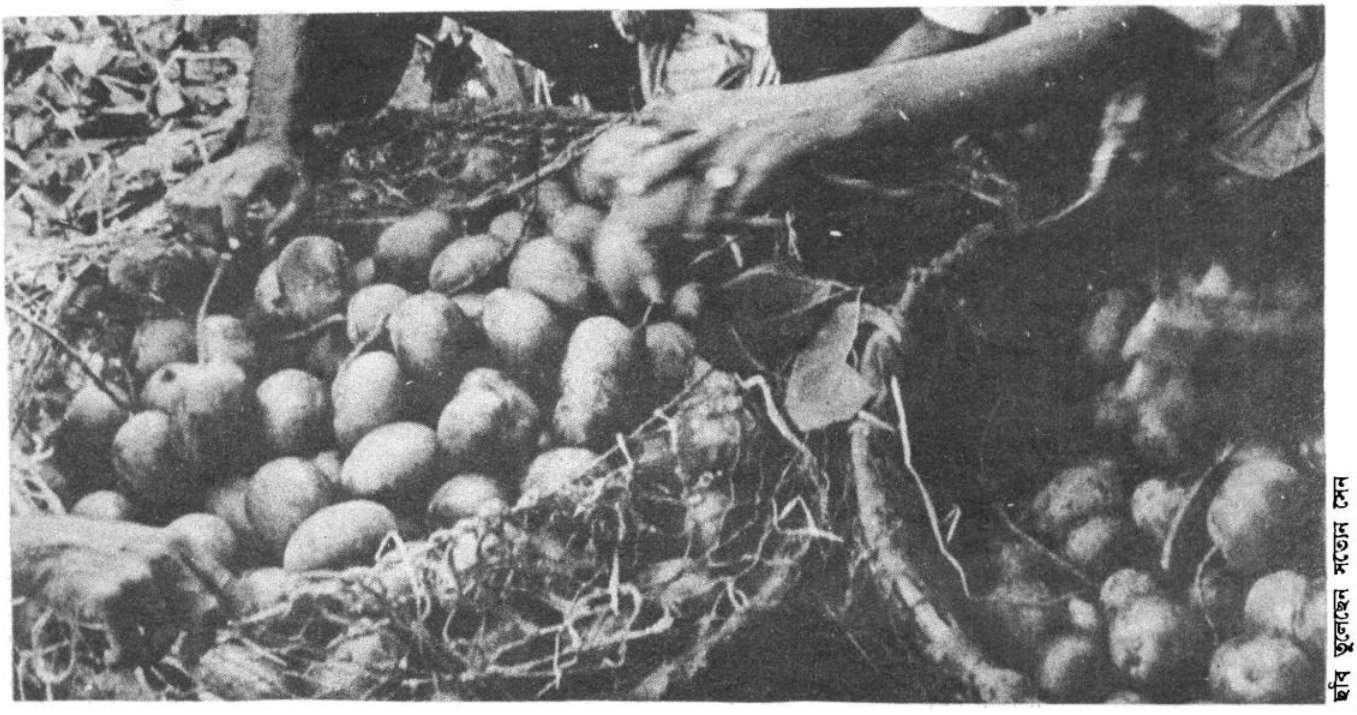

ছবি তুলেছেন সত্যেন সেন

ফুলের রানী গোলাপ আর ফলের রাজা আম। আমের জন্মস্থান এই ভারত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সিংহল। সিংহলকে এখন বলে 'শ্রীলংকা'। আগে বলত শুধু 'লংকা'। সেখানে তখন প্রচুর লংকা হত কিনা জানি না, কিন্তু আম যে হত, সে-কথার উল্লেখ আছে রামায়ণে।

রামায়ণের গল্প জান তো? পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম গেলেন বনে ; সঙ্গে গেলেন সীতা আর লক্ষ্মণ। লংকার রাজা রাবণ একদিন সীতাকে চুরি করে নিয়ে পালান। সীতা উদ্ধারের জন্য রাম মিতালি পাতালেন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের সঙ্গে। দেশে দেশে সুগ্রীবের বাহিনী ছুটল সীতার খোঁজে। হনুমান গেলেন লংকায়। তাঁর কাছে রামের খবর পেয়ে খুব খুশি হলেন সীতা। খেতে দিলেন একটি আম। হনুমান আম খাননি আগে। খেয়ে দারুণ ভাল লেগে গেল তাঁর। আরও খেতে সোজা হানা দিলেন রাবণের সাধের আম্রকুঞ্জে। ফলে হনুমানকে বেঁধে তাঁর লেজে আগুন দিয়ে দেওয়া হল। তারপর সেই আগুনে লংকাদাহ।

আম নিয়ে আরও এক মজার গল্প আছে। প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্যের কথা তখন লোকের মুখে মুখে। গজনির সুলতানের কানে গেল সেটা। সত্যি-মিথ্যা খোঁজ নিতে পাঠালেন উজিরকে। উজির বহু জায়গা ছদ্মবেশে ঘুরে দেখে ফিরে গেলেন গজনি। সুলতানকে ভারতের ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিতে দিতে একসময় এলেন সে-দেশের ফলের কথায়। "হুজুর, হিন্দুস্তানে দেখলাম এক আজব গাছ ; এদেশের খেজুরের মত একপায়ে খাড়া। মাথার উপর ইয়া বড় বড় ফল। ঈশ্বরের কী দয়া। ঐ ফলের ভিতর রেখেছেন ভূখাদের জন্য দুখানা মিষ্টি রুটি আর এক লোটা মিঠা পানি!" বুঝতে পেরেছ আশা করি—উজির বলছিলেন আমাদের নারকেলের কথা। তারপর তিনি এলেন আমের প্রসঙ্গে। বললেন, "আমার অপরাধ মাফ করবেন। আমার এই পাকা দাড়িতে যদি গুড় আর পাকা তেঁতুল একসঙ্গে চটকে ঘন করে মাখি আর আপনি সেটা চুষতে থাকেন, তাহলে তখন যে স্বাদ পাবেন—ঠিক সেইরকম স্বাদের একটা ফল আছে হিন্দুস্তানে। হিন্দুস্তানীরা তাকে বলে আম।"

আমের এমন বিচ্ছিরি বর্ণনা শুনে উজিরের উপর রাগ হয় আমাদের। হয় তাঁর বরাতে ভাল আম জোটেনি ; নয়ত তখন ভাল আম ছিলই না এদেশে। নইলে উজিরের ঐ আমের সঙ্গে আমের সেরা 'ল্যাংড়ার' কি কোন তুলনা হয়?

সেই ল্যাংড়া আমের কথায় আসছি। কাশীর পেয়ারার মত কাশীর আমেরও বেশ নাম। অনেক দিন আগের কথা। তখন কাশীর বাজারে অনেক রকমের আম আসত। তার মধ্যে স্বাদে-গন্ধে সেরা একটা আম পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। এই আম আসে এক খোঁড়া ভদ্রলোকের বাগান থেকে। অন্য আম ছেড়ে খরিদ্দারেরা ভিড় করেন এই আম কিনতে। তাই বাজারে এ-আমের চাহিদা খুব, দামও বেশী। খোঁড়াকে বলে 'ল্যাংড়া'। ফিরিওয়ালা হেঁকে হেঁকে বিক্রি করে, "ল্যাংড়ার বাগানের আম কিনুন, ল্যাংড়ার বাগানের আম"। "ল্যাংড়ার বাগানের আম"—মুখে মুখে ছোট হতে-হতে এক সময় দাঁড়াল "ল্যাংড়া আম"। পরে আরও ছোট হয়ে "ল্যাংড়া"। এটা অবশ্য গল্পই। সত্যি-মিথ্যা জানি না।

মাসিক আনন্দমেলায় দারুণ গা-ছমছম-করা উপন্যাস

'কাপালিকরা এখনও আছে'

পড়েছিলে তো? যিনি লিখেছিলেন, সেই বিখ্যাত লেখক

বিমল কর

আরও রোমাঞ্চকর একটি উপন্যাস

লিখেছেন। মাসিক আনন্দমেলায় শিগগিরই সেটি

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

বেটন কাপ জিতল মোহনবাগান

ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ

লেঃ জেঃ জেকবের হাত থেকে কাপ নিচ্ছেন বেটন-বিজয়ী মোহনবাগানের অধিনায়ক রতন চৌধুরী

বেটন কাপ জিতেছে মোহনবাগান। পাঁচবার যুগ্ম-জয়সহ মোট বারোবার তারা বেটন পেল। তিরাশি বছরের পুরনো এই প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্য কোন হকি দল বারোবার বেটন জিততে পারেনি। কাস্টমসের রেকর্ড ছিল এগারোবারের।

বেটন কাপের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল এক সময়। অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক শক্তিশালী দল আসত বেটন কাপ জয়ের জন্য। ঐ সব দলে থাকত অনেক নামী-নামী খেলোয়াড়। কলকাতাতেও তখন কাস্টমস, পোর্ট কমিশনার্স, বি এন আর, রেঞ্জার্স ও ভালহৌসির খুব নামডাক ছিল। ফলে লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, ঝাঁসি, ভূপাল, বোম্বাই থেকে যে দলগুলি আসত, তাদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিত এখানকার দলগুলি। কলকাতার দলগুলি থেকে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে কয়েকজন খেলোয়াড় স্থান পেত। অনেক দর্শক আসত খেলা দেখতে। বেটন কাপকে কেন্দ্র করে হকির জমজমাট আসর বসত। আস্তে আস্তে বেটনের আকর্ষণ কমে যেতে থাকে। অন্যান্য রাজ্যের শক্তিশালী দলের যোগদানের আগ্রহে ভাটা পড়ে। বেটন অনেক ম্লান হয়ে যায়।

অবশ্য, গত কয়েক বছরের তুলনায় এবারের বেটন কাপ হকি উৎসাহীদের কাছে বেশ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। গতবারের বেটন বিজয়ী এ এস সি জলন্ধর, রানার্স-আপ সি আর পি এফ দিল্লি, দিল্লির ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনস ও বোমবাইয়ের ওয়েস্টার্ন রেলের যোগদানের জন্যই আকর্ষণ বেড়েছিল। বর্তমানে ভারতীয় হকিতে এই দলগুলির খুব নাম আছে। সি আর পি এফ তো কিছুদিন আগে ভারতের আর-একটি বড় হকি প্রতি-যোগিতায় গোল্ড কাপ জিতে কলকাতায় খেলতে এসেছিল।

তবে, যেমন আশা করা গিয়েছিল, নামকরা অনেক খেলোয়াড় নিয়ে গড়া ঐ দলগুলি সেরকম খেলতে পারেনি। প্রথমেই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের কথা ধরা যাক। সুরজিৎ সিং, আসলাম শের খাঁ, অশোককুমার, গোবিন্দ ও ইমানুর রহমানের মত অলিম্পিক খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও এয়ারলাইনস অতি সাদামাটা খেলা খেলেছে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রামগড়ের পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে এ এস সি-র কাছে তারা হারে। গোবিন্দ, অশোককুমার বা আসলাম শের খাঁ যে কোনজন, তা বলে না দিলে দর্শকদের পক্ষে খেলা দেখে চেনা অসম্ভব ছিল। ইনামুরের তো বয়স হয়েছে, তার কথা ছেড়েই দিলাম। একমাত্র সুরজিৎ কিছু খেলেছে।

রামগড়ের পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, জলন্ধরের সিগনাল্স রেজিমেণ্ট বা জলন্ধরের ১১২ ব্যাটালিয়ন টি এ; দিল্লির ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স ছিল সাধারণ শক্তিসম্পন্ন। রৌরকেলা স্টিল মোটামুটি খারাপ খেলেনি। স্থানীয় দলগুলির মধ্যে ই আর এ এ সুনামের সঙ্গে খেলেছে। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের প্রথম দফার খেলায় ওদের সেরা ফরোয়ার্ড গোপালজী গুরুতরভাবে আহত না হলে হয়ত আরও ভাল খেলত।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স-আপ এ এস সি ও সি আর পি এফ পাওয়ার হকি খেলে। অর্থাৎ ওদের খেলায় ছিল শক্তির প্রাধান্য। এ এস সি নিঃসন্দেহে শক্তিশালী দল। রক্ষণভাগ জবরদস্ত। পুরোভাগে ভিনসেণ্ট লাকড়া এবং ল্যাজারাস লাকড়া বিপজ্জনক। সেমিফাইনালে ওয়েস্টার্ন রেলের কাছে হারে। আর সি আর পি এফ পরাজিত হয় কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে।

এবারে মোহনবাগান গোরখপুরের নর্থ ইস্টার্ন রেলকে ও দিল্লির সি আর পি এফকে হারিয়ে সেমিফাইনালে স্থানীয় ই আর এ এ-র মুখো-মুখি হয়। দু দফার সেমিফাইনালে ই আর এ এ হারে মোট দুই গোলে। এরপর ফাইনাল খেলা হয় ওয়েস্টার্ন রেলের সঙ্গে। প্রথম দফা ফাইনালে মোহনবাগান ২—১ গোলে জয়ী হয় এবং দ্বিতীয় দফা ফাইনালে ১—১ গোলে ড্র করে। কিন্তু, দুটি খেলার গোলের হিসাবে মোট ৩—২ গোলে জয়ী হয়ে বেটন লাভ করে। দু দিনের ফাইনাল খেলা বিচার করলে দেখা যায় মোহনবাগান সব থেকে ভাল খেলে প্রথম দিনে। বিশেষ করে প্রথম দিনে প্রথমার্ধে মোহনবাগান যে খেলা খেলেছিল, প্রতিযোগিতার অন্য কোন খেলাতেই তেমন আর খেলতে পারেনি। সেদিনের খেলায় যেমন ছিল গতি তেমনি ছিল খেলোয়াড়ের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া। রাইট আউট ডিনকে আটকানো ওয়েস্টার্ন রেলের পক্ষে ধরতে গেলে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় দিনে কিন্তু ওয়েস্টার্ন রেল আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেছিল। মোহনবাগানের গোলরক্ষক ফ্রেডেরিকস অসাধারণ খেলে ওয়েস্টার্ন রেলকে জিততে দেয়নি।

ওয়েস্টার্ন রেল ফাইনালে পরাজিত হলেও আমার মতে ওরাই ছিল এবারের সেরা দল। দুর্ঘটনায় এবং খেলায় ওদের নিয়মিত চার-পাঁচজন খেলোয়াড় আহত না হলে ওয়েস্টার্ন রেল বোধ হয় হারত না। ওদের পুরোভাগ ছিল খুব শক্তিশালী। অলিম্পিকখ্যাত বলবীর সিং এবং অভিজ্ঞ পুরণ সিংয়ের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া আছে। ছোট ছোট পাসে, তীব্র-গতিতে ও দক্ষতায় ওদের আক্রমণধারা ছিল দেখার মত। রক্ষণভাগে প্রমোদ বাটনা খুব নির্ভরযোগ্য, পেনালটি কর্নার মারায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে। বলবীর সিং এবারের বেটনে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর মত খেলোয়াড় এবারের প্রতিযোগিতায় আর একজনও চোখে পড়েনি।

শ্রীখেলোয়াড়

ওভারবাউণ্ডারির রাজা

পুষ্পেন সরকার

আর্থার গিলিগানের ক্রিকেট দল ভারত সফরে এসেছে। সরকারীভাবে এম সি সি দলের প্রথম ভারত সফর। বোম্বাইতে জিমখানা মাঠে হিন্দু দলের সঙ্গে দুদিনের খেলা। ১৯২৬ সালের ১ ডিসেম্বরের সকাল। আগের দিন এম সি সি ঝড়ের গতিতে ৩৬৩ রান তুলেছে। ওদের মধ্যে গাই আর্লে নামে একজন ব্যাটসম্যান সব থেকে বেশী আনন্দ দিয়েছেন দর্শকদের। ভারতীয় ফাস্ট বোলার রামজীর একটি বল হুক করে এসপ্লানেড রোডের উপর ফেলেছেন। আর একটি বল ফেলেছেন সিডেনহ্যাম কলেজের তাঁবুর মাথায়। রামজীর আরও দুটি বলের একটিতে গাই আর্লে প্যাভেলিয়ানের কাঁচ ভাঙেন, আর অন্যটি গিয়ে পড়ে মাঠের বাইরে এক গাছের মাথায়। ঐ গাছে চড়ে যাঁরা খেলা দেখছিলেন, ভয়ে তাঁরা সবাই গাছ থেকে নেমে পড়েন। প্রথম দিনের শেষে হিন্দু দল ১ উইকেটে ১৬ রান তোলে। তার আগে আর্লে ৬টি ওভারবাউণ্ডারি ও ১১টি বাউণ্ডারির সাহায্যে করে ১৩০ রান।

এম সি সির বাঘা বাঘা বোলার টেট, গিয়রি, আরসার, বয়েস ও স্টিলের বিরুদ্ধে হিন্দু দলের ব্যাটসম্যানরা দ্বিতীয় দিনের শুরু থেকেই সতর্ক হয়ে খেলতে থাকেন। ৩ উইকেটে ৮৪। পাঁচ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে সি কে নাইডু মাঠে নামেন। বয়েস বল করছেন। দুটো বল দেখেশুনে ফরোয়ার্ড খেললেন সি কে। রান হল না। তৃতীয় বল। সি কের ব্যাটে একটা আওয়াজ হল। দেখা গেল বোলারের মাথার উপর দিয়ে বল উড়ে চলেছে। ঠকাস করে গিয়ে পড়ল প্যাভেলিয়ানের মাথায়। অপরিচিত এক তরুণ ব্যাটসম্যান হয়তো হঠাৎ করে ফেলেছে, এই ভেবে সকলে চুপ করে থাকে। এম সি সির বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ছক্কা। পরের ওভারে ঐ বয়েসের বলেই আর একটা ছক্কা হাঁকড়ালেন সি কে। সারা মাঠ চিৎকারে ফেটে পড়ল। আনন্দ চাপতে না পেরে আম্পায়ার দুজনও হাততালি দিয়ে ফেলে পরে লজ্জিত হলেন। বোলার পালটানো হল। অ্যাস্টিল এলেন। আর একটি ছক্কা। সারা মাঠে তখন আনন্দের বন্যা। মধ্যাহ্নভোজের সময়ে সি কে ৫০ রানে নট আউট।

বাতাসে খবর ছড়িয়ে পড়েছে বোম্বাই শহরে। স্টেডিয়ামে তিল ধারণের জায়গা নেই। আশপাশের গাছগুলিতে বাদুড় ঝোলা ঝুলছে মানুষ। মাঠের কাছাকাছি সব বাড়ির ছাদে গিজগিজ করছে লোক। মধ্যাহ্নভোজের পর আর এক বোলার ওয়েস্ট এলেন বল করতে। প্রথম ওভারে নাইডু মারলেন দুটি ছক্কা, দুটি চার। মোট নিলেন ২২ রান। ঘন ঘন বোলার পরিবর্তন করেও নাইডুর রান ওঠার গতিকে নামান গেল না। অবশেষে ১১৫ মিনিটে ১৫৩ রান করে নাইডু যখন আউট হয়ে বীরের মত প্যাভেলিয়ানের পথে পা বাড়ালেন, তখন স্কোর বইতে দেখা গেল ঐ ১৫৩ রানের মধ্যে তিনি ১১টি ওভারবাউণ্ডারি মেরেছেন। এম সি সির অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন শ্যামবর্ণ, দোহারা অথচ শক্ত চেহারার এই তরুণকে।

কোটারি কানকাইয়া নাইডুর এই হচ্ছে ব্যাটিং। কোন বোলারকে ভয় করে খেলতে কেউ কখনও তাঁকে দেখেনি। বাউণ্ডারি তো অনেকেই মারে। তিনি মারতেন ওভারবাউণ্ডারি। যখন তখন। তাই অনেকে ইংল্যাণ্ডের ওভারবাউণ্ডারি মারে খ্যাত জেমসের সঙ্গে তুলনা করে বলত 'ইণ্ডিয়ান জেমস'। শুধু ব্যাটসম্যান হিসাবে নয়, বোলিং, ফিল্ডিং এবং দল-পরিচালনা, সব বিভাগেই তাঁর কীর্তি ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। ক্রিকেটে তাঁর মত প্রতিভা ভারতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছে।

১৮৯৫ সালে ৩১ অক্টোবর নাগপুরে নাইডুর জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষেরা মাদ্রাজ থেকে এসে নাগপুরে বসবাস শুরু করেন। ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলোয় তাঁর প্রতিভা সকলের চোখে পড়ে। হিসলপ কলেজিয়েট হাইস্কুলে পড়ার সময়ে তিনি উঁচু ক্লাসের ছেলেদের দলে সব সময় জায়গা পেতেন। ক্রিকেট, ফুটবল, দৌড় ইত্যাদি সমস্ত খেলাতেই তিনি ছিলেন স্কুলের সেরা। নাইডুর বাবা ও কাকা দুজনেই ভারতের অমর ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজীর সহপাঠী ছিলেন। খুব বন্ধুত্ব ছিল। স্কুলে পড়ার সময়ে একবার নাইডুর খেলা দেখে রঞ্জি নাইডুর বাবাকে বলেছিলেন, "দেখ, তোমার ছেলের মধ্যে প্রতিভা আছে। কিন্তু ওকে রক্ষণাত্মক ক্রিকেট খেলা ছাড়তে বল। তা না হলে ও বড় হতে পারবে না।"

নাইডুর বাবা ছিলেন ক্রিকেটে দারুণ উৎসাহী। 'নাইডু ক্রিকেট জিমখানা' নামে ওদের নিজেদেরই একটা ক্রিকেট দল ছিল। প্রতি বছর বারো-চোদ্দ হাজার টাকা ব্যয় হত এই দলের জন্য। বাড়ির পিছনে একটা গাছে দড়ি দিয়ে টেনিস বল ঝুলিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করতেন নাইডু। তাদের স্কুল 'বৌডন শীল্ডে' যোগ দিল। নাইডুর বয়স সাত। কিন্তু স্কুলের ব্যাটিং, বোলিং বা ফিল্ডিংয়ে সব থেকে বড় ভরসা তিনি। স্কুলে ক্রিকেটে দশটি সেঞ্চুরি করেছিলেন নাইডু।

নাইডুর ক্রিকেট-গুরু ছিলেন তাঁর বাবা। পিতার আদেশ ছিল, "উইকেট খারাপ হোক আর ভাল হোক, বোলার জোরে বল করুক আর আস্তে বল করুক, তুমি প্রতিটি বল শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে মারবে। রোদ, বৃষ্টি, শীত সব আবহাওয়াতে খেলে শরীরকে শক্ত করবে।" নাইডু তাঁর পিতার এই শিক্ষার কথা চিরদিন গর্বের সঙ্গে সকলের কাছে বলে গেছেন। তিনি বলতেন, "এই শিক্ষা আমার মনে দুর্জয় সাহস এনে দিত। আমার চোখের দৃষ্টি ছিল প্রখর। ফুটওয়ার্কও ভাল ছিল। ফলে

ইনরেকো রেকর্ডে
রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অমর কাহিনী

ছড়া গানে রামায়ণ

'বহুরূপী' অভিনীত
রবীন্দ্রনাথের
ডাকঘর নাটক

এই এল. পি. রেকড দুটি সংগ্রহ করতে ভুলো না

এখনই তোমাদের রেকর্ড ডিলারের কাছে খোঁজ করো

দি ইণ্ডিয়ান রেকর্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ৪৫, মতি শীল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৩
ফোন ঃ ২৩-৪৯০৬ (৩টি লাইন) গ্রাম ঃ ইণ্ডরেকডস্

IDL/IRM/2B

নিসার, অমর সিং, রামজী বা গ্রিমেটের মত বোলাররাও আমাকে কখনও উইকেটে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেননি।"

মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেটে যোগ দেন 'হিন্দু' দলের হয়ে। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দর্শকদের সব থেকে প্রিয় হয়ে ওঠেন। কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেটে তিনি ৪৪ ইনিংসে ৪৪ বার নট আউট থেকে করেছিলেন ১৯৩৪ রান। যার গড় হিসাব ছিল ৪৮.৩৫। এ ছাড়া পেয়েছিলেন ২৯টি উইকেট। পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেটে ৮টি ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ছিল ২২২। আর উইকেট পেয়েছিলেন ৯টি। বোলারকে পেটাতে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ, তেমনি মাথা খাটিয়ে বল করে ব্যাটসম্যানদের ঠকাতেও ছিল তাঁর আগ্রহ।

গিলিগানের দলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নাইডুর হাতে-খড়ি। ১১টি ইনিংসে তিনি ৩৪৮ রান করেছিলেন। ১৯৩২ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সরকারীভাবে প্রথম ইংল্যান্ড সফর। একটি টেস্ট খেলা হয়, এবং সে খেলায় অধিনায়ক ছিলেন নাইডু। লর্ডসে এম সি সির বিরুদ্ধে তাঁর অপরাজিত ১১৮ ও ৩১ রানে ৪ উইকেট সারা ইংল্যান্ডে আলোচনার বস্তু হয়েছিল। এইটাই ছিল তাঁর সফরে প্রথম খেলা। সফরে মোট ১৮৪২ রান এবং ৭৯টি উইকেট নিয়ে বিশ্বের সেরা পাঁচজন ক্রিকেটারের অন্যতম হিসাবে উইজডেন ক্রিকেট বইতে নির্বাচিত হন নাইডু। ১৯৩৩-৩৪ সালে জার্ডিনের ভারত সফরকারী ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টেই নাইডুকে ভারতের অধিনায়ক করা হয়। তিনটি টেস্ট নিয়ে মোট ১০টি খেলায় তিনি করেছিলেন ৫৭৭ রান। ১৯৩৫-৩৬ সালে জ্যাক রাইডারের অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ভারত সফরের সময়ে অধিনায়কের পদ থেকে অন্যায়ভাবে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবুও নাইডু দুটি টেস্টে ভারতের হয়ে নামেন। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরে তাঁকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হল না। আদর্শ খেলোয়াড় নাইডু তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা অপমানিত না হয়ে সাধারণ একজন খেলোয়াড় হিসাবে সফরে যান। ৪১ বছর তখন তাঁর বয়স। তবুও সফরে মোট করেছিলেন ১,১০২ রান। এ ছাড়া রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটেও তাঁর বহু স্মরণীয় ইনিংস আছে। সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে নাইডুকে বিচার করলে ভুল করা হবে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং এবং অধিনায়কত্ব সব দিক নিয়ে বিচার করলে বিশ্বের সর্বকালের সেরা অধিনায়কদের মধ্যে সি কে নাইডুকে স্থান না-দিয়ে উপায় নেই।

কোন অবস্থাতেই ভীত না হয়ে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিরাশ না হয়ে গোটা দলের জন্য সব সময় চিন্তা করা এবং জয়ের জন্য দুঃসাহসিক সংগ্রাম করাই ছিল নাইডুর ক্রিকেট দর্শন। বাম্পারে রক্ত করেছে। বুকে আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। মুখে বল লেগে দাঁত খসে গেছে। তবুও সকল আঘাত তুচ্ছ করে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাট ধরেছেন। এবং খেলেছেন অনেক স্মরণীয় ইনিংস। যৌবনে এবং ছাত্রাবস্থায় ক্রিকেট ছাড়াও, ফুটবল, হকি, টেনিস, বিলিয়ার্ড, পোলো স্কোয়াস প্রভৃতি খেলাতেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। শিকারী হিসাবে তাঁর লক্ষ্য ছিল নির্ভুল।

নাইডুর চাকরি জীবন কেটেছে হোলকারের মহারাজার এ ডি সি হিসাবে। সাংসারিক জীবনে তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় গৌখিন এবং রুচিবান পুরুষ। ক্রিকেট মাঠের সবুজ ঘাসের উপর ছিল জন্মগত আকর্ষণ। তাই বাড়ির আবসাবপত্র সব সাজিয়েছিলেন সবুজ রং দিয়ে। মা কালীর দারুণ ভক্ত ছিলেন তিনি।

হোলকার দলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁর শেষ খেলা ১৯৫২-৫৩ সালে রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার বিরুদ্ধে ফাইনাল। ইডেনে বাংলার জয়কে কী করে তিনি অসম্ভব করে দিয়েছিলেন, সেদিন মাঠে সাংবাদিক হিসাবে উপস্থিত থেকে তা নিজের চোখে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। ভাগ্যের পরিহাসে রঞ্জি ট্রফিতে ৬০ বছর বয়সে তাঁকে জীবনের শেষ খেলা খেলতে হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের হয়ে হোলকারের বিরুদ্ধে। এই খেলায় ব্যক্তিগত ৬০ রান এবং অনুজ সি এস নাইডুর সঙ্গে পঞ্চম উইকেট জুড়িতে করেছিলেন ১১৪ রান। ১৯৫৭ সালে দিল্লিতে প্রবীণ ও নবীনের প্রদর্শনী খেলায় ৬৩ বছর বয়স্ক সি কের ৬৩ রানের সংগ্রামী ইনিংস কোনদিন ভুলতে পারবে না দর্শকেরা। ক্রিকেট লেখক, বেতার ভাষ্যকার, সংগঠক এবং তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের উন্নতির প্রধান সমর্থক সি কে নাইডু ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের অনেকটা জায়গা একাই জুড়ে রেখেছেন। ১৯৬৭ সালের ১৪ই নবেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

বিখ্যাত তিন ক্রিকেটার

গত ক্রিকেট মরসুমে অস্ট্রেলিয়া আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা যখন এক একটি বিস্ময়কর প্রদর্শনের চমক লাগাচ্ছিল, তখন এদেশে আমাদের অনেকের মনে হয়েছিল যে, এই দারুণ ক্রিকেটারদের খেলা একবার দেখতে পেলে হয়। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে পাকিস্তান দলের ভারত ভ্রমণের সম্ভাবনা কম। কিন্তু এই পাকিস্তান দলের তিন বিখ্যাত খেলোয়াড়—অধিনায়ক মুস্তাফ মহম্মদ, সহ-অধিনায়ক আসিফ ইকবাল, আর প্রাক্তন অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম—এদেশ ঘুরে গেছেন. আমাদের কলকাতাতেও খেলেছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর শেষ হবার আগেই ৩৫ বছর বয়স্ক ইন্তিখাব টেস্ট ক্রিকেট থেকে তাঁর অবসর ঘোষণা করেন। আর আসিফ-মুস্তাক আগে যা বলে এসেছেন, তার থেকে মনে হয় যে, ওঁরাও টেস্ট ক্রিকেটে আর নাও খেলতে পারেন। গত কয়েক মাসের 'আনন্দমেলা'র পাতায় এই পাকিস্তান দলের আরও কয়েকজনের কথা বলা হয়েছিল। এঁরা হলেন, ভূতপূর্ব ক্যাপ্টেন মজিদ খাঁ, আর পেস বোলার ইমরান খাঁ ও সরফরাজ নাওয়াজ। এবার ইন্তিখাব-আসিফ-মুস্তাকের সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

ইন্তিখাবের বর্তমান চেহারা দেখলে এঁকে চট করে ক্রিকেট খেলোয়াড় বলে মনে হবে না। এঁর মাথাজোড়া টাক, গড়ন মোটাসোটা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে তিনি মাত্র একটি টেস্ট খেলেন, কারণ মুস্তাক ছাড়া দলে আরও উঠতি খেলোয়াড় ছিল, যাঁরা "ইন্তি"র মতন লেগব্রেক বল করেন। তবে ইন্তিখাব প্রায় পঞ্চাশটি টেস্ট খেলে ১২৫-এর মতন উইকেট নেওয়া ছাড়াও করেছেন হাজার দেড়েক রান। প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৫৯-৬০ সালে, আর তাঁর প্রথম বলেই অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার কলিন ম্যাকডনাল্ডকে আউট করেন।

ফজল মামুদের দলের সঙ্গে ইন্তিখাব ৬০-৬১র সিজনে এদেশে আসেন। কলকাতায় তিনি তার ১৯ বছর পূর্ণ হবার তিন দিন পরে ৫৬ রান করেন, আর ম্যাচের দুই ইনিংস মিলিয়ে চারটি উইকেট পান ৬৮ রানে। ক্রমশ ইন্তিখাব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেগস্পিন ও গুগলি বোলার হিসাবে স্বীকৃতি পান। ইংল্যাণ্ডের সারে কাউণ্টি দলে খেলার ডাক আসে; দেশের দলনায়ক হন। ১৯৭২-৭৩'এ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি খেলায় প্রচণ্ড মেরে খেলে ১৩৮ রান করেন। সারা পৃথিবীর কাছে অলরাউণ্ডার হলে ইন্তিখাবের বেশ নাম ছিল, তবে গত মরশুমে মনে হয় তাঁর খেলা পড়তির দিকে।

ইন্তির সঙ্গে সেই ১৯৬০-৬১'র কলকাতা টেস্টে অনেকক্ষণ ব্যাট করেছিলেন মুস্তাক। করেছিলেন ৬১। চার বছর পরে মুস্তাক আবার ইডেনে খেলে যান, মোহনবাগান ক্লাবের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সময়, সেবারেও বড় খেলাটিতে পঞ্চাশের বেশি রান করেন। সুন্দর ব্যাট করেন মুস্তাক, তিনি একজন লেগব্রেগ বোলারও। তিনি প্রায় পঞ্চাশটি টেস্ট খেলেছেন তাঁর মোট রান সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি, উইকেট পেয়েছেন প্রায় ব্যাটটি। মুস্তাক খুব রোগা ছিলেন, এখন বেশ গোলগাল হয়েছেন। মুস্তাক টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়, সর্বকনিষ্ঠ শতরানকারী। তাঁর জন্ম ১৯৪৩ সালে, তবে জানুয়ারি না নভেম্বর মাসে, সেই নিয়ে একটা 'রহস্য' বয়ে গেছে। দাদা ওয়াজির ও হানিফ, আর ছোট ভাই সাদিক সবাই টেস্ট তারকা।

দু-মাস আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকালে মুস্তাকের ফর্ম এণ্ড পড়ে যায় যে, দু-তিনজন পাকিস্তানী ক্রিকেট সমালোচক তাদের কাগজে লেখেন, মুস্তাকের নিজেকে দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত। তার উত্তর মুস্তাক দেন পোর্ট-অফ-স্পেনে চতুর্থ টেস্টে। দুই দফায় রান করেন ১২১ আর ৫৬. বেলিংয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে পান ২৮ রানে পাঁচ উইকেট, দ্বিতীয়বারে ৬৯ রানে তিনটি—প্রধানত তাঁরই জন্যে পাকিস্তান টেস্ট জেতে।

আসিফ ইকবাল

ইন্তিখাব আলম

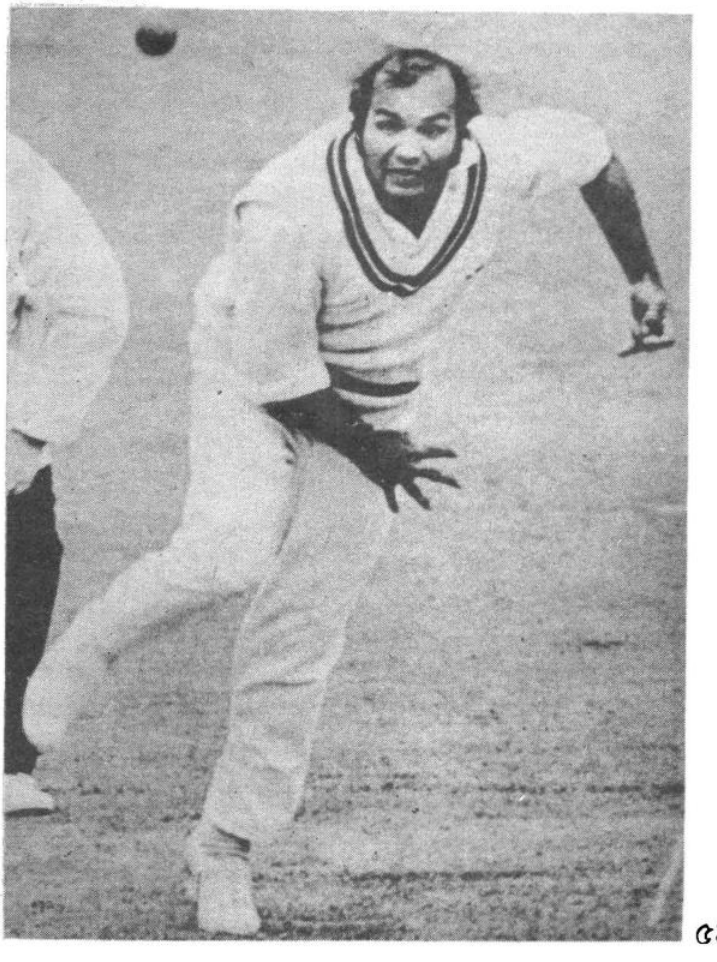

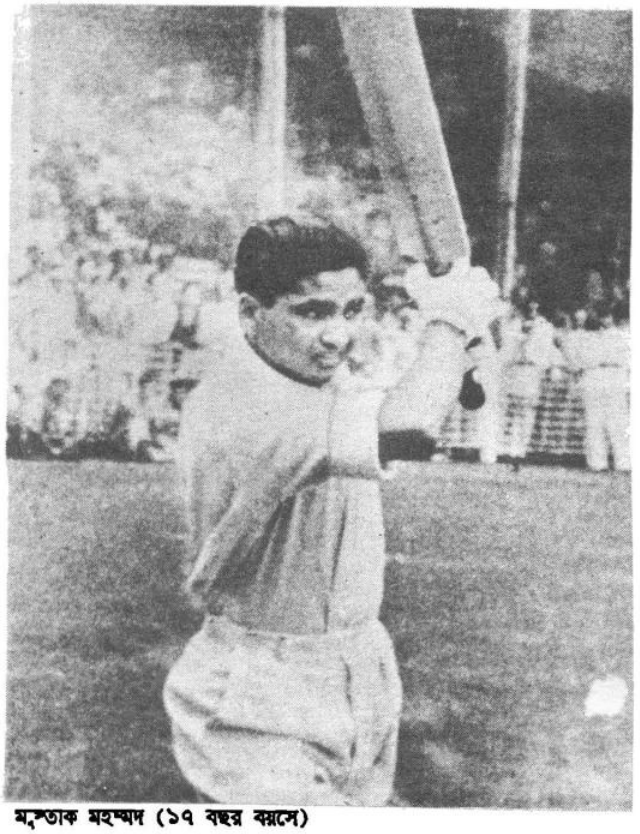

মুস্তাক মহম্মদ (১৭ বছর বয়সে)

কিংস্টনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম টেস্ট জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবশ্য সিরিজে জয়লাভ করে। সেই খেলায় পাকিস্তানের হিরো আসিফ। যেটি তাঁর জীবনের সম্ভবত শেষ টেস্ট ম্যাচ ইনিংস হতে পারে, তাতে তিনি চমৎকার খেলে ১৩৫ রান করেন, দলকে গোহারান হারের মুখ থেকে সম্মানযোগ্য পরাজয়ের অবস্থায় নিয়ে যান। আসিফ অস্ট্রেলিয়াতেও তাঁর শেষ টেস্ট খেলায় এমন এক দারুণ শতরাণ করেন। এই জুন মাসের ছয় তারিখেই আসিফের ৩৫তম জন্মদিন। তিনি ১৯৬৪ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ৪৫টি টেস্ট খেলেছেন। তাঁর রান সংখ্যা প্রায় হাজার তিনেক। তিনি মিডিয়াম-পেস বল করে প্রায় ষাটটি উইকেট নিয়েছেন। মুস্তাক যেমন ইংলিশ কাউন্টি খেলায় নর্দাম্পটনশায়ার দলের অধিনায়ক, আসিফ তেমনি কেন্ট দলের ক্যাপ্টেন। দুই বছর আগে প্রুডেনশাল বিশ্ব-কাপ প্রতিযোগিতায় তিনি দেশের অধিনায়কত্বও করেছিলেন।

আসিফ কিন্তু ইন্তিখাব-মুস্তাকের মতন ৬০-৬১'তে এদেশে আসেননি। সত্যি কথা বলতে, সেই সময় আসিফ আমাদের দেশেরই বাসিন্দা। এমন কী সফরকারী পাকিস্তানী দলের বিরুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে খেলে অল্প রানের বিনিময়ে ছয়টি উইকেট পান। এই বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়ের পুরা নাম আসিফ ইকবাল রজভই। তিনি জন্মগ্রহণ করেন নিজাম-শাসিত হায়দ্রাবাদে। তাঁরই ছোটকাকা হচ্ছেন ভারতের প্রাক্তন টেস্ট অফ-স্পিনার ও বর্তমান ক্রি-কন্ট্রোল বোর্ড সম্পাদক গুলাম আমেদ। স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির হয়ে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় একাধিকবার প্রচণ্ড সেঞ্চুরি হাঁকান, খেলেন হায়দ্রাবাদের জন্য রঞ্জি ট্রফি ম্যাচে। তবে ১৯৬১-তে চলে যান করাচি।

কলকাতায় আসিফ খেলেন ১৯৫৮-৫৯ সিজনে, কোচবিহার ট্রফির খেলায় দক্ষিণাঞ্চল স্কুলের হয়ে। তবে স্মরণীয় তেমন কিছু করেননি। কলকাতায় আজও বেশ কিছু লোক আছেন, যাঁরা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বা রাজস্থান ক্লাব মাঠে ওই খেলাগুলি দেখেছেন, কিন্তু তাঁরা হয়তো জানেনই না যে, তাঁরা পাকিস্তানের ওই তেজস্বী আসিফ ইকবালের ব্যাটিং দেখেছেন!

দ্বাদশ ব্যক্তি

শতবর্ষের উইম্বলডন

চিরঞ্জীব

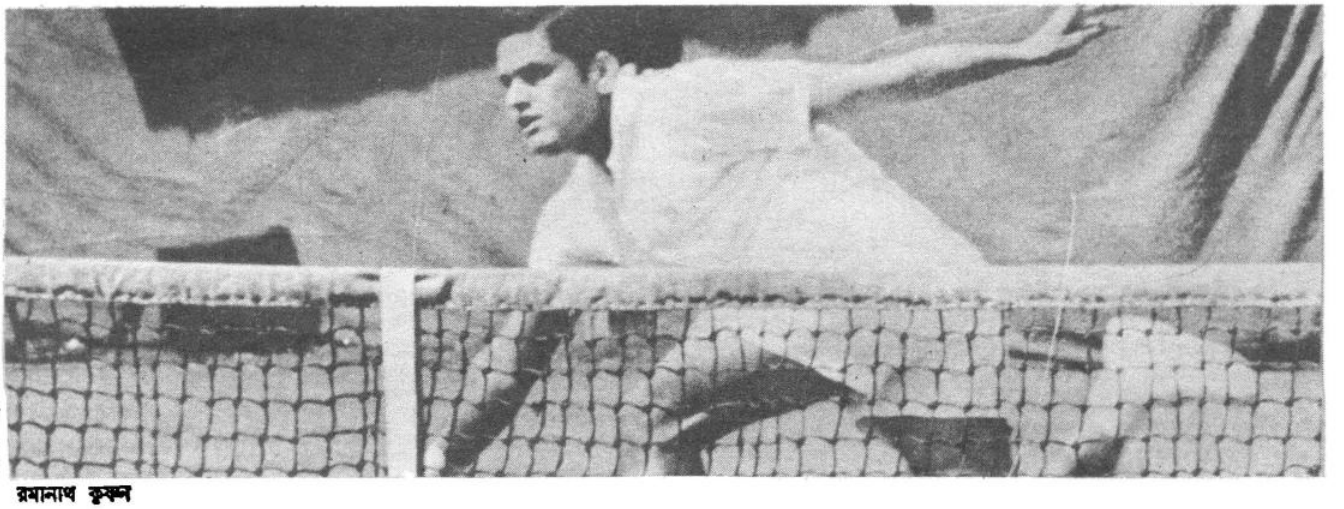

ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ

রমানাথ কৃষ্ণন

বিশ্বের খেলাধুলোর ইতিহাসে ১৯৭৭ সালটা নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই তো কমাস আগে টেস্ট ক্রিকেটের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। এই জুনে একশ বছর পূর্ণ হবে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপসের। লন টেনিসের ইতিহাসে সারা দুনিয়ায় এত পুরনো প্রতিযোগিতা আর নেই। গত একশ বছরের মধ্যে উইম্বলডন চালুর অনেক পরে, একাধিক বড়-বড় টেনিস প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপস, ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপস, অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপস খুবই উল্লেখযোগ্য। টেনিস বিশেষজ্ঞরা একে 'গ্রাস কোর্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ' আখ্যা দিয়েছেন।

লন্ডনের শহরতলি উইম্বলডনে এখন খেলা হয় চার্চ রোডের কোর্ট-গুলোয়। শুরুতে কোর্ট ছিল ওয়ারপল রোডে এবং ১৯২২ সাল পর্যন্ত ওখানেই প্রতি বছর উইম্বলডন টেনিস হয়েছে। শতবর্ষ আগে প্রথম প্রতিযোগিতার কথাগুলো জানলে বেশ অবাক লাগে। সেবার খেলা হয়েছিল ওয়ারপল রোডের দু ধারের দুটি কোর্টে। দর্শকসংখ্যা ছিল ২০০। তাঁদের জন্য কোনো আসন ছিল না। ১৮৭৭-এ প্রথম প্রতিযোগিতায় মাত্র ২২টি এণ্ট্রি এসেছিল: ২৭ বছর বয়সী স্পেনসার ডব্লিউ গোরে পুরুষ সিঙ্গলস ফাইনালে ৬—১, ৬—২, ৬—৪ হারান ডব্লিউ সি মার্শালকে। প্রথম বছর ডাবলস হয়নি। ডাবলসের খেলা চালু হয় ১৮৭৯-তে। আর মেয়েদের প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৮৮৪ থেকে, ডাবলস শুরু ১৯১৩ সালে।

এখন উইম্বলডনে পুরুষ সিঙ্গলস বিজয়ী পান দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার। গোরে পেয়েছিলেন ২৫ গিনি দামের একটি রুপোর কাপ। অল ইংল্যাণ্ড ক্লাব পরিচালিত ওই প্রতিযোগিতার পুরস্কারটি দিয়েছিলেন একজন সাংবাদিক। তিনি 'দ্য ফিল্ড' পত্রিকার সম্পাদক জে এইচ ওয়ালশ। একশ বছর আগের প্রতিযোগিতায় গোলমালও দেখা যায় বেশ। আসলে তখন তো এখনকার মত নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ছিল না। কোর্ট কত বড় হবে, পয়েণ্ট কীভাবে গোনা হবে, নেটের মাপই বা কী—কারুরই সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিয়েছিল। প্রথম প্রতিযোগিতার পরেই একটি কমিটি ওই সব জট খুলে দেন নিয়মকানুন তৈরি করে। সেবার খেলা হয়েছিল রবারের বলে। ওই বলের উপর সাদা ফ্লানেল জড়ানো ছিল।

এখন আমরা রড লেভারের চারবার চ্যাম্পিয়নশিপ (১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৮, ১৯৬৯) ঘিরে হইচই করি, রয় এমার্সনের দুবার (১৯৬৪ ও ৬৫), জন নিউকোম্বের তিনবার (১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৭১) চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিয়ে কাগজের হেডলাইন করি, কিন্তু রেনশ ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃতিত্ব আজও কেউ ম্লান করতে পারেননি। ওদের একজনের নাম আর্নেস্ট, আর একজন উইলি। উইলি সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হন ১৮৮১, ১৮৮২, ১৮৮৩, ১৮৮৪, ১৮৮৫, ১৮৮৬ ও ১৮৮৯-তে। এবং আর্নেস্ট ১৮৮৮-তে। ডাবলসে ১৮৮০ থেকে ১৮৮৯-এর মধ্যে মাত্র তিনবার খেতাব ওদের হাতছাড়া হয়েছিল।

১৮৯৬-এর আগে পর্যন্ত উইম্বলডনে শুধু ব্রিটিশদের দেখা যেত। প্রথম বিদেশী খেলোয়াড় আমেরিকান। ১৯০৫ সালে প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭১-এ। প্রতিযোগী তখন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নিউজিল্যাণ্ড, সুইডেন ও দক্ষিণ আফ্রিকার। ভারতীয়দের এণ্ট্রি অনেক পরে। ১৯২৩-এ যখন কোর্ট তৈরি হল চার্চ রোডে, তখনই ভারতের এস এম জ্যাকবকে যুক্তরাষ্ট্রের ভি রিচার্ডসের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যায়।

শত বছরের ইতিহাসে তারপর কমসংখ্যক ভারতীয়কে উইম্বলডনের কোর্টে দেখা যায়নি, কিন্তু সেমি-ফাইনালের উপরে কেউ উঠতে পারেননি। রমানাথন কৃষ্ণনই কেবল ১৯৬০ ও ১৯৬১-তে সেমি-ফাইনালে ওঠেন।

ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ

বিলি জিন কিং

বিজয় অমৃতরাজ কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছিলেন ১৯৭৩-এ। ঘাউস মহম্মদ কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন ত্রিশের দশকে।

'ব্রিটিশদের খেলা' হলেও বিদেশীদের অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে খেতাব চলে যেতে থাকে বাইরে। ত্রিশের দশকে ফ্রেড পেরীর আগমন পর্যন্ত ওই অবস্থা ছিল। ১৯০৫-এ মেলবোর্নের বাঁ-হাতি খেলোয়াড় এন ই ব্রুকস চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে পৌঁছান। মেয়ে সিঙ্গলসের খেতাব চলে গেল প্রথম বিদেশে ওই বছরই। ক্যালিফোর্নিয়ার মে সাটন ওই গৌরবের অধিকাঙ্গিনী।

১৯২২-এর পর যখন চার্চ রোডে চলে গেল উইম্বলডন টেনিস, চ্যালেঞ্জ রাউন্ডও তুলে দেওয়া হল সঙ্গে সঙ্গে। এর দু বছর পর থেকে প্রবর্তিত হয় বাছাই বা সিডিং। ১৯২০-তে একজন আমেরিকান উইম্বলডন বিজয়ী হন, কিন্তু ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত চার ফরাসীর আধিপত্য দেখা যায়। ও'রা জাঁ করোত্রা, রেনে লাকোস্টে, হেনরি কোচেট ও জকোয়ে ব্রাগনন।

দশ'করা টিকিট কিনে হতাশ হন ১৯৩১-এর পুরুষ সিঙ্গলস ফাইনাল দেখতে না পেয়ে। ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের ১১ বছর বয়সী সিডনি উড ওয়াক ওভার পান আহত ফ্রাঙ্ক শিলডস না খেলায়।

ষাটের দশকের শুরু থেকেই অস্ট্রেলীয়দের প্রাধান্য দেখা দিতে থাকে উইম্বলডনে। লুইস হোড ১৯৫৬-য় শুরু করেন। তারপর জিতে চলেন রড লেভার, অ্যাশলে কুপার, নিয়েল ফ্রেজার, রয় এমার্সন; জন নিউকোম্বরা। চেকোস্লোভাকিয়ার ইয়ান কোডেস ঘাসের কোর্টে দারুণ খেলোয়াড় না হলেও ১৯৭৩-এ খেতাব জিতলেন বহু শীর্ষস্থানীয় উইম্বলডন বয়কট করায়। সোভিয়েট থেকে এবারই প্রথম একজন—আলেক্স মেট্রেভেলি ফাইনালে ওঠেন। উইম্বলডনে তারপর তিন বিস্ময় জিমি কনর্স, আর্থার অ্যাশ ও বুয়র্ন বর্গ।

আগেই বলেছি, মেয়েদের সিঙ্গলস শুরু হয় পরে, কিন্তু উইম্বলডনকে বহুকাল মেয়েদেরই কোর্ট বলা হত। কারণও ছিল। মেয়েরা খেলতে নামলে টিকিট নিয়ে ইডেনের টেস্টের মত হুড়োহুড়ি পড়ত। ভিড় সেই প্রথমবার ১৮৮৪ থেকেই। ফাইনালে সেবার মড ওয়াটসন ৬—৮, ৬—৩, ৬—৩ হারান এল ওয়াটসনকে। মেয়েদের গ্রুপে বহু বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। ১৮৮৬ সালে যে ব্ল্যাঙ্ক বিংলে (বিয়ের পরে জি হিলিয়ার্ড) চ্যাম্পিয়ন হন, তিনি ২৫ বছরের পরে ১৯১২ সালেও সেমিফাইনালে খেলেন। সবচেয়ে কম বয়সে বিজয়িনী ১৫ বছর ১০ মাসের মাথায় লটি ডড ১৮৮৭ সালে। ডরথি ডগলাস (পরে লাম্বার্ট চেম্বার্স) ১৯০৩ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে সাতবার চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু বিলি জিন কিং-এর মত রেকর্ড কারুর নেই। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত প্রতিবারই তিনি ফাইনালে গেছেন, এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন পাঁচবার। জিতেছেন ১৯৭৫ সালেও। কিং তাই টেনিস-কুইন।

উইম্বলডনে বিজয় ও'দের বিখ্যাত করে তুললেও প্রথম সারির অনেকেই আজও এর খেতাব থেকে বঞ্চিত। এদের মধ্যে যেমন কেন রোজ-ওয়াল, ইল নাস্তাসে, গিলারমো ভিলাস, টনি রোশরা রয়েছেন, তেমনি মেয়েদের মধ্যে ন্যান্সি গুন্টার, অ্যান জোনস, রোজমেরি ক্যাসলসরাও।

শতবর্ষে উইম্বলডনের খেতাব কার জন্য অপেক্ষা করছে এখন তাই-ই দেখার!

রমেশ কি তার বাবার মতো খেলবে ?

সুব্রত সরকার

এই জুন মাসের শেষের দিকে উইম্বলডন শতবার্ষিকীর সময় আমাদের যদি এমন কথা মনে হয় যে; এই বিশ্বশ্রেষ্ঠ লন টেনিস প্রতিযোগিতার একশো বছরের ইতিহাসে একজনও ভারতীয় খেলোয়াড় কোনও খেতাব লাভ করতে পারেনি, তাহলে সেটা একেবারে পুরোপুরি ঠিক হবে না। লণ্ডন শহরের দক্ষিণপ্রান্তে অল-ইংল্যাণ্ড ক্লাবে যে পাক্ষিক টেনিস উৎসব হয়, তার দ্বিতীয় সপ্তাহে খেলা হয় ছোটদের বিশেষ কম্পিটিশন জুনিয়ার উইম্বলডন—আর সেই প্রতিযোগিতার বালকদের সিঙ্গলসে একবার জিতেছিলেন আমাদের কৃষ্ণন, তেইশ বছর আগে, ১৯৫৪ সালে।

কৃষ্ণনের সেটি তৃতীয়বার জুনিয়ার উইম্বলডন খেলা। আর এই বছর প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে কৃষ্ণনের ছেলে রমেশ। অনেক দিন ধরেই রমেশের নাম শোনা যাচ্ছে উঠতি খেলোয়াড় বলে : দেশে অল ইণ্ডিয়া হার্ড-কোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপসহ অনেক টুর্নামেণ্টেই সে জিতেছে নিজের বাবাকেও ক'বার হারিয়েছে। তবে এ তো জানা কথাই যে, আমাদের দেশের আজকালকার টেনিস খেলার মানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ডের (জুনিয়ারদের ক্ষেত্রেও) অনেক ফারাক। আগামী ২৭শে জুন থেকে জুনিয়ার উইম্বলডন প্রতিযোগিতা চালু হবে। তাতে রমেশ কেমন খেলে, সেটা আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করব।

উইম্বলডনের ইতিহাস দেখতে গেলে এই জুনিয়ারদের (বয়েজ আর গার্লস্ সিঙ্গল্স) টুর্নামেণ্ট মাত্র সেদিন আরম্ভ হয়েছে—১৯৪৯ থেকে। অর্থাৎ এইবার ২৯তম জুনিয়ার উইম্বলডন। এই প্রতিযোগিতার সিনিয়ার ইভেণ্টের মতন কেবল খেলার যোগ্যতাই এণ্ট্রির একমাত্র বিচারের মান নয়। যখন জুনিয়ার উইম্বলডন আরম্ভ করা হয়, তখন কর্মকর্তাদের ইচ্ছে ছিল, ওইখানে খেলে ভবিষ্যতের টেনিস-তারকারা যেন আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার সঠিক স্বাদ পায়। ইণ্টারন্যাশনাল লন টেনিস ফেডারেশনের প্রতিটি সদস্য-দেশ থেকে বালক আর বালিকা বিভাগে অন্তত একটি করে খেলোয়াড় পাঠাতে বলা হয়। তবে কিছু কিছু দেশ থেকে কোনও এণ্ট্রি না আসায় এক এক সময় টেনিসের 'বড়' দেশগুলি থেকে তিন চারজনও খেলে। এণ্ট্রির শর্ত হল, প্রতিযোগিতার বছরে প্রতিযোগীর বয়স আঠারো বছরের বেশী হবে না। ১৯৫৯-এর ১লা জানুয়ারির পর জন্মেছে, এই বছর এমন সব খেলোয়াড় আইনত যোগ্যতাসম্পন্ন। জুনিয়ার উইম্বলডনে গিয়ে পৃথিবীর চারিধারের উঠতি টেনিস-খেলোয়াড়রা অন্যান্য প্রতিযোগীর দেশ আর সেখানকার খেলাধুলোর শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে যায়।

কৃষ্ণন প্রথম জুনিয়ার উইম্বলডন খেলেছিলেন ১৯৫২ সালে। তিপ্পান্নতে সেমিফাইনালে হারার পর চুয়ান্ন সালে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলি কুপারকে (যিনি ১৯৫৮ সালে পুরুষদের সিঙ্গল্স জেতেন) হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। এরপর আরও দুজন ভারতীয় জুনিয়ার উইম্বলডন ফাইনালে উঠে হেরে যান। ১৯৫৮ সালে কলকাতার ছেলে প্রেমজিৎ লাল (অধিকাংশ লোকে এঁকে পাঞ্জাবী ভাবলেও, এঁর মা-বাবা দুজনেই বিহারের বাসিন্দা) রানার-আপ হন, আর ১৬ বছর পরে অমৃতরাজ-ত্রয়ীর কনিষ্ঠ, অশোক, শেষ খেলায় পরাজিত হন। জুনিয়ার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন যে পরে পুরুষদের সিঙ্গল্স জিতেছে, এমন নজির অবশ্য খুবই কম। তবে গতবারের মেন্স চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের বুয়র্ন বর্গ তার মাত্র চার বছর আগেই—১৯৭২ সালে—বালকদের সিঙ্গল্স জিতেছিলেন।

রমেশের জন্ম ১৯৬১ সালের ৫ই জুন। অর্থাৎ সে আরও দু বছর জুনিয়ার উইম্বলডন খেলার সুযোগ পাবে। গত দুই বছরই রমেশ ভারতীয় জুনিয়ার দলের সঙ্গে বিদেশে খেলেছে। রমেশ ছাড়া আরও একজন ভারতীয় যদি জুনিয়ার উইম্বলডনে খেলার সুযোগ পায়, এবার তাহলে সেই স্থানটি পাবে পুনার কলেজছাত্র নন্দন বল। নন্দনের এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১৮ বছর পূর্ণ হবে। আর বালিকা বিভাগে—যেখানে গতবার কলকাতার মেয়ে সুসান সিনক্লেয়ার জোনস খেলেছিল—দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে মাদ্রাজের ১৬ বছরের মেয়ে অমৃতা আলুওয়ালিয়া।

জুনিয়ার দলকে বিদেশ ভ্রমণের আগে প্রস্তুত করার জন্য এপ্রিলের শেষের দিকে কলকাতা সাউথ ক্লাবের লনে জাতীয় কোচ আখতার আলির অধীনে এক কোচিং ক্যাম্প হয়। রমেশ, নন্দন আর অমৃতা ছাড়া জুনিয়ার দলের বাকি দুজন এইখানে অনুশীলন করে—হায়দ্রাবাদের ছেলে কৃষ্ণ

ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ

ভূপতি, আর রমেশের পিসতুতো দাদা শঙ্কর, যে গত দু বছর জুনিয়ার উইম্বলডন খেলেছিল।

তবে সত্যি কথা বলতে, এই পাঁচজনের জুনিয়ার (শঙ্কর এই বছর কুড়িতে পা দিয়েছে, আর ভূপতিরও অক্টোবরে উনিশ পূর্ণ হবে) দলের মধ্যে একমাত্র রমেশেরই ভবিষ্যতে উঁচু মানের খেলোয়াড় হবার সম্ভাবনা আছে। এই বছর সে যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ করে কলকাতায় এল, দেখা গেল বেশ অনেকটা মোটা হয়ে গেছে। তবে কিছুদিন প্র্যাকটিসের পর ওজন কমে গেল, আর তার বাবার খেলার অনেক গুণ যে রমেশ পেয়েছে তা আবার দেখতে পাওয়া গেল।

মে মাসেই প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফরাসী চ্যাম্পিয়নশিপের জুনিয়ার ইভেণ্টে রমেশ নামে। আর এই মাসের শেষে খেলবে তার প্রথম জুনিয়ার উইম্বলডন। আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে এদেশ থেকে আরেকজন দক্ষিণ ভারতীয় সুনাম অর্জন করতে পারবে কি না, তার প্রথম সার্থক আভাস আমাদের এই বছরেই পাওয়া উচিত।

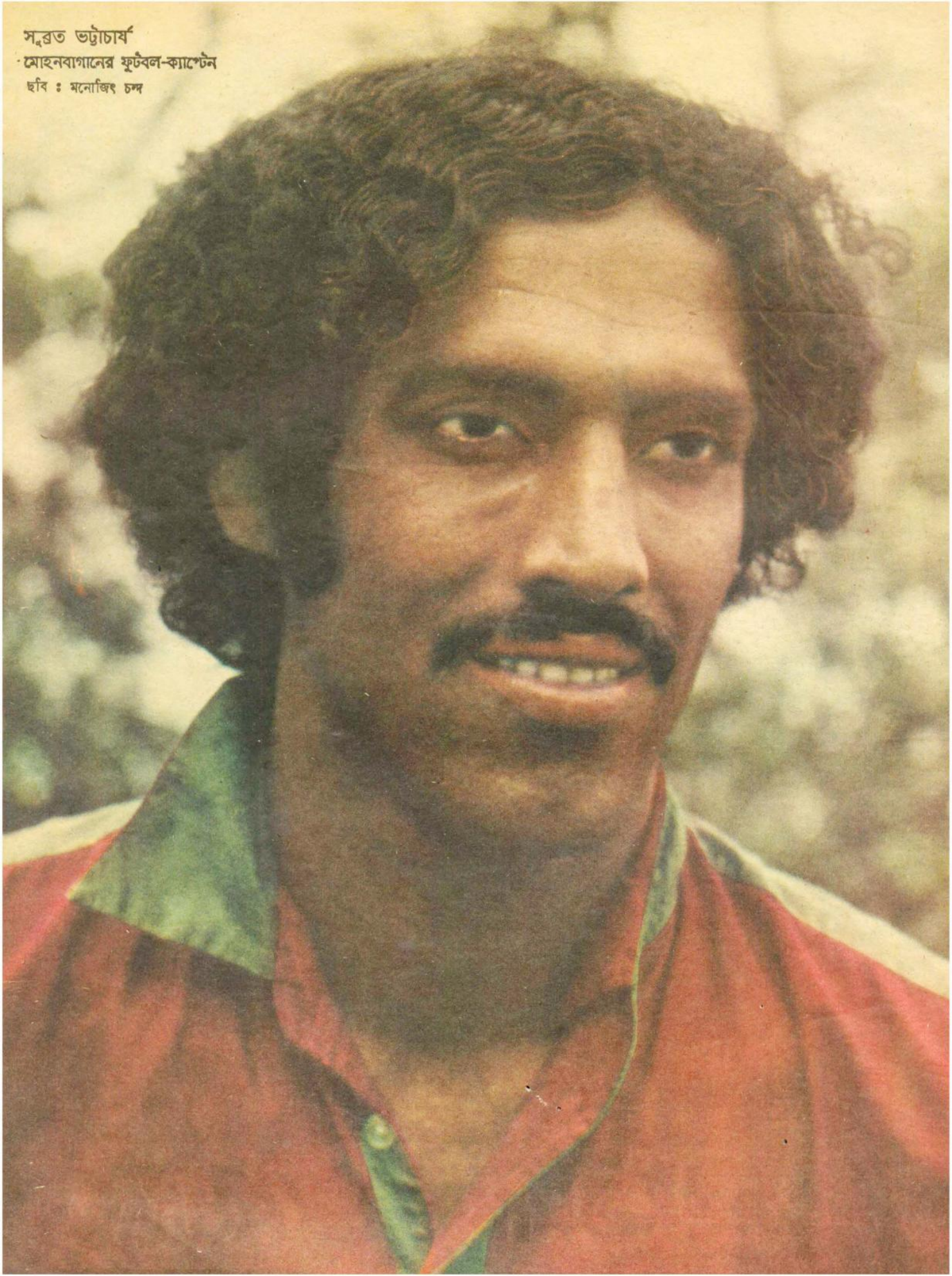

সুব্রত ভট্টাচার্য
মোহনবাগানের ফুটবল-ক্যাপ্টেন
ছবি : মনোজিৎ চন্দ

শ্যামল ঘোষ
ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল-ক্যাপ্টেন
ছবি : মনোজিৎ চন্দ

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

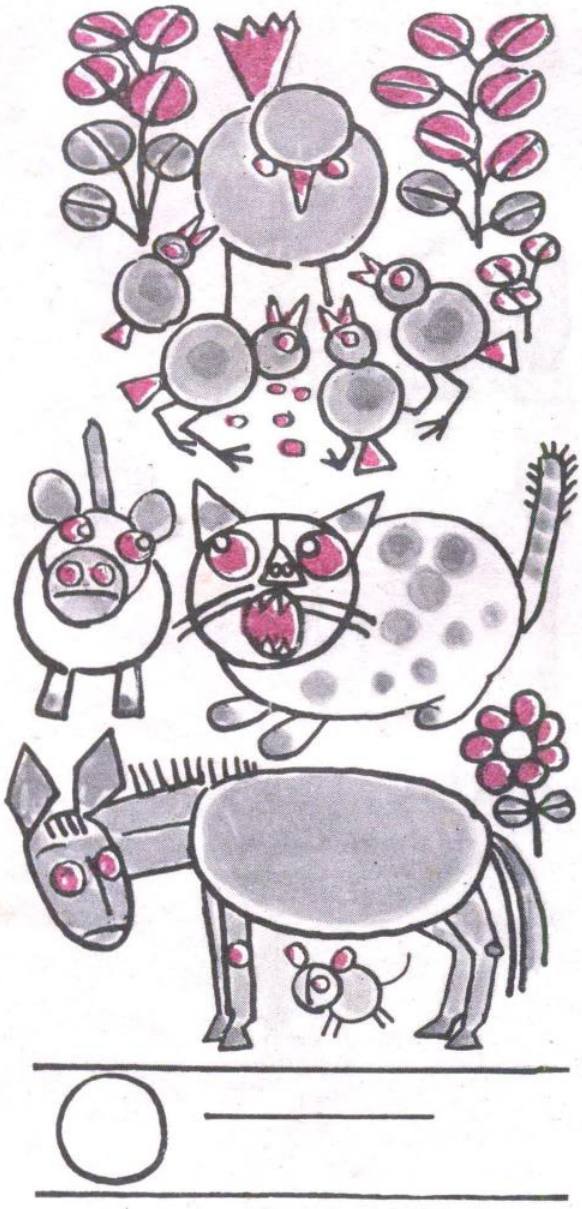

একই কাজ, অনেক রঙ

রং নয়, সেই একই আকার, আর তাই দিয়ে কেবল তোমাদের কল্পনার নানান জানলা খুলে দেবার চেষ্টা। গতবার নানানভাবে মানুষকে তার চলাফেরার মধ্যে পেয়েছ, এবার সেই আকার দিয়েই আঁকো নানান জন্তু-জানোয়ার; আর যদি পারো, তাহলে এদের চলাফেরার জায়গা করে দাও মানুষের রোজকার জীবনে।

কারিগর

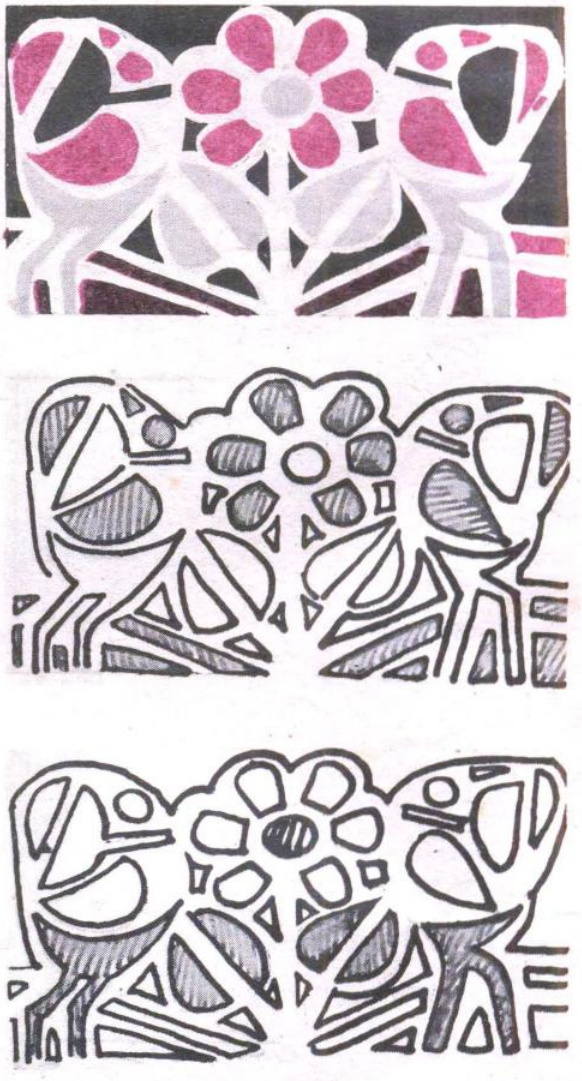

এক আকার, অন্য ছবি

এবার জানো কীভাবে অনেক রং দিয়ে গতবারে শেখা একই কাজ করতে হয়। গতবারে জোগাড় করা জিনিস দিয়েই শুরু করো। তোমার আঁকা ছবিতে কটা রং ব্যবহার করেছ দেখে, আর সেইমতো প্রত্যেক রঙের জন্যে আলাদা আলাদা কাগজে, একই নকশার প্রতিলিপি তুলে নাও কারবন দিয়ে হুবহু। এবার মূল ছবিতে যেখানে যা রং আছে, সেইমতো চিহ্ন করে গলা মোম মাখিয়ে নাও সেই সেই অংশে। এখন ছবির রং মাফিক কেটে বাদ দাও। প্রত্যেকটি কাগজ থেকে তার রং অনুযায়ী বাদ দিতে হবে। এখানে নমুনা তোমাদের দেখিয়েছি। এইভাবে তোমার ছবিতে অনেক রং ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, প্রত্যেকটি রঙের জন্য আলাদা কাগজ নিতে হবে। কাটার কাজ শেষ হলে মূল ছবি দেখে প্রত্যেকটি রং পর পর ছাপতে থাকলেই, দেখবে একই ছবিকে বার বার কেমন একই ভাবে ফিরে পাচ্ছ।

জেনে রাখো—প্রত্যেকটি কাগজের গায়ে একটি চিহ্ন রাখলে ছাপার সময় রং সরে যাবার ভয় থাকবে না। এই চিহ্ন রাখাকে ছাপা-কাজে "চাবি-চিহ্ন" বলে। মনে রেখো, কেটে বাদ দেওয়া অংশগুলোই কিন্তু এক-একটি রং। এখানে-দেওয়া তিন রঙের ছবির মধ্যে লাল আর ছাই রং কেটে দেখানো আছে।

ব্যাঙ্ক ব্যাপারটা কী?
ব্যাঙ্ নয় বোকা ব্যাঙ্ক, যেখানে টাকা থাকে
চল দেখে আসি
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
কি ব্যাঙ্?
ধ্যুৎ কতকগুলো টিকিটঘর আর কী সব লেখা
দেখলি মহিলার এক গাদা টাকা লোকটা লুকিয়ে ফেললো
চল ঐ ভদ্রলোককে বলি
এই প্রথম ব্যাঙ্কে এলে তাইনা?
হ্যাঁ
কিন্তু মহিলার?
ভয় নেই উনি টাকা জমা রাখলেন

চলবে

রাম ও শ্যাম আর সার্কাস পালানো হাতি

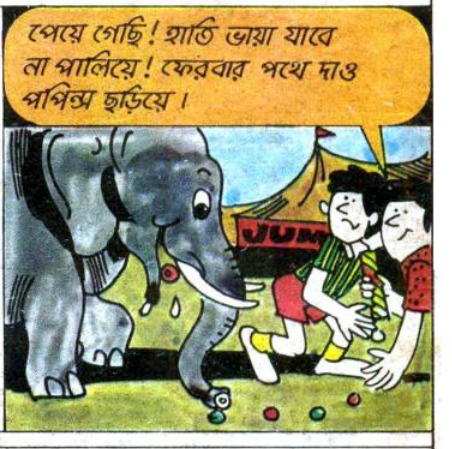

খেতে ভাল
দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল

পার্লে পপিন্স
মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স
৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর — রাস্পবেরী, আনারস, লেবু, কমলালেবু ও মুসম্বী।

everest/871/PP-bn